দ্বৈপায়নে দুর্যোধন

ডঃ দীপক চন্দ্র

শুকসারী প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৫৮

শুকসারী প্রকাশক
শান্তি আচার্য
১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলকাতা-১৪

বিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
দিলীপ মুখোপাধ্যায়

আমার বৈবাহিক ও বৈবাহিকা :

শ্রী মনোরঞ্জন ভৌমিক

শ্রীমতী শংকরী ভৌমিক

প্রিয়বরেষু

দৃষ্টিকোণ

মহাভারতের আখ্যানভাগে দুর্যোধন বিশাল জায়গা জুড়ে আছে। তাই মহাভারতের পটভূমিতে লেখা আমার সব উপাখ্যানে মহানায়ক দুর্যোধন এসেছে অনিবার্যভাবে। ঘটনার টানা-পোড়নে হাজির হয়েছে পার্শ্বচরিত্ররূপে। কিন্তু সেখানেই দুর্যোধনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। বরং পাঠক-পাঠিকার আরো কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠেছে। এঁদের অনেকে দুর্যোধনকে নিয়ে একটি পৃথক উপন্যাস লেখার দরবার করেছেন। তাঁদের দাবি মেনে নিয়ে এই উপন্যাস শুরু করি। কিন্তু কাজটা আমার পক্ষে খুব কঠিন ছিল। তাই লেখার কাটাকুটি খেলায় কেটে গেছে অনেকগুলো মূল্যবান দিন। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে লেখা বাতিল করার কথা ভেবেছি। কিন্তু মায়া ও মোহ বশে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারেনি।

দুর্যোধনের জীবনটাই এরকম। জন্ম থেকেই তাকে বিসর্জন দেবার দাবি উঠেছে। তবু সব বিরোধ, প্রতিকূলতা অস্বীকার করে অন্ধ পিতা-মাতা পরম স্নেহে তাকে আঁকড়ে ধরেছে, প্রতিপালন করেছে। লেখার সময় আমারও সেই অবস্থা। দুর্যোধনের ভাবনায় দিনের পর দিন যখন নষ্ট হচ্ছে, কাজ এগোচ্ছে না, তখন আমার চারপাশের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুরা রঙ্গ-তামাশা করে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে বলেছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো আমিও তাকে ত্যাগ করতে পারিনি। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও দুর্যোধনকে ত্যাগ করিনি। দুর্যোধন দুর্যোধনের মতোই বেঁচেছে এবং মরেছে। আর সে তো একটা গোটা জীবনের মূল্যায়নের ব্যাপার।

উপন্যাসের আরম্ভ তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিন বা শেষের দিন থেকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরাজয় যখন অনিবার্য হলো তখন রণক্ষেত্র থেকে দুর্যোধন পালিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের গুপ্ত পর্বত গুহায় আশ্রয় নিল। ভীরু কাপুরুষ বলেই কি দুর্যোধন পালাল? এই প্রশ্ন এখানেই করা সাজে। দুর্যোধনের রাগ, অভিমান, অহঙ্কার আকাঙ্ক্ষায় তার হৃদয় উত্তাল হয়ে উঠল। অনুশোচনা জাগল এই প্রথম। যন্ত্রণা, বেদনা, দুঃখ, হাহাকার একলা বহন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। সেই কথা কেউ জানে না, বলে না, ভাবে না। দুর্যোধনও কি সে কথা চিন্তার অবসর পেয়েছে কোন দিন? জানত কি একজন অসাধারণ মানুষও সাধারণ মানুষের মতো একা, বিপন্ন, অসহায় এবং দুঃখী। দ্বৈপায়নের গুপ্তকক্ষে আত্মগোপনকারী দুর্যোধন তন্ন তন্ন করে নিজের আত্মাকে খুঁজেছে

ফুরিয়ে যাওয়া, নিভে যাওয়া দুর্যোধনের বিশ্বাসই হয়না—সে হারল কি করে? কেন হারল? কাদের জন্যে হারল? যাদের বিশ্বাস করল, তারা সেই বিশ্বাসের মূল্যে কতটুকু দিল? তাদের কাছ থেকে সারা জীবন ভরে পেল কী? হিসেব করে অঙ্ক মেলাতে পারল না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মোট অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে তার ছিল একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য। এছাড়া বৃহত্তর ভারতের ছোট বড় পঁচিশটি রাজ্য, সৈন্য এবং সমর-উপকরণ নিয়ে তার পক্ষে যোগ দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল মাত্র ছয়টি রাজ্য। তবু সে হারল আঠারো দিনের মাথায়।

কেন হারল? কেউ ভাবে না সে কথা। কিন্তু দুর্যোধনকে তো ভাবতে হয়। তার জন্যে একটু একা থাকা দরকার। দ্বৈপায়ন হ্রদের গুপ্ত কক্ষের নিরাপদ আশ্রয়ে সে প্রথম অনুভব করল, হারের জন্যে তার ভুল যুদ্ধ-স্ট্র্যাটেজিই দায়ী। পিতামহ, আচার্য দ্রোণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সে অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুদ্ধের ভুলগুলো শুধরে নতুন প্রত্যয়ে বাঁচতে চায় বলেই দ্বৈপায়নে আশ্রয় নিল। কিন্তু ভাগ্যের হাতে বীর পুতুল সে। তাই যুদ্ধ তার, জয় তার নয়। যন্ত্রণা তার, তৃপ্তি তার নয়। এই ট্রাজেডিকে মুছতে চেষ্টা

করেছে তার বীর্য দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে, আজীবন প্রচেষ্টা দিয়ে। পারল কি ? মানবভাগ্যের খেয়ালী নিয়ন্তা দ্বৈপায়ন হ্রদের নিরাপদ আশ্রয়ে টেনে এনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল তাকে।

কিন্তু নিয়তির অন্ধকারে ডুবে যায়নি তার জীবন। মহতের সন্ধানে সে জীবন মহান। বীর্যের আবাহনে সে জীবন সার্থক। কুরুক্ষেত্রের রঙ্গভূমি তার শেষ আশ্রয় হলেও দুর্যোধনের নাম তারার মতো ফুটে থাকে পরজন্মের চিত্তাকাশে।

ডঃ দীপক চন্দ্র

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিন। সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশী। অমাবস্যা।

মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত হলো। কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা এবং শকুনি জীবিত থাকতে দুর্যোধন তাকে সেনাপতি করায় বেশ একটু অবাক হলো। এতবড় সম্মান তার প্রাপ্য নয়, তবু দুর্যোধন সেই মর্যাদা দিয়ে তাকে ধন্য করল।

কে কীভাবে কার সঙ্গে কোথায় যুদ্ধ করবে ছক এঁকে বুঝিয়ে দিল শল্য। যুদ্ধ হচ্ছিল সমগ্র কুরুক্ষেত্র জুড়ে। কৌরবপক্ষের যে অল্প কয়েকজন বীর যোদ্ধা জীবিত ছিল তারা ছোট ছোট বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে পাণ্ডবদের উপর চড়াও হলো। মাটি কামড়ে সকলে যুদ্ধ করছিল। প্রথম দিকে পাণ্ডব সৈন্যেরা পর্যুদস্ত হলো। কিন্তু অল্পক্ষণের ভেতর তারা কৌরবপক্ষের তীব্র আক্রমণ সামলে নিল। যুদ্ধ হলো সমানে সমানে। ঝড়ের তাণ্ডবে বৃক্ষশাখা যেমন এদিক-ওদিক ঝাপ্টায় তেমনি ঝাপ্টিয়ে বেড়াল কৌরবেরা। যুদ্ধে জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল তারা। সমগ্র রণভূমি চষে বেড়াল। কিন্তু পাণ্ডবদের নিপুণ রণকৌশল এবং সংহত আক্রমণের সামনে বেশিক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারল না।

প্রথমেই নিহত হলো শকুনি-নন্দন উলূক। পুত্রের মৃত্যু শকুনিকে যুদ্ধে মরিয়া করে তুলল। বিপদের কথা না ভেবে কালান্তক যমের মতো খুঁজে বেড়াতে লাগল পুত্রহন্তা সহদেবকে। তার শোক-সন্তপ্ত অন্তঃকরণ পরিবর্তিত হলো প্রচণ্ড প্রতিহিংসায়। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে অদৃষ্ট তেমন শকুনিকে সহদেবের দিকে টানল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোন সুযোগ দিল না সহদেব। তার তীক্ষ্ণ বর্শা শকুনির বর্ম ভেদ করে এফোঁড়-

এফোঁড় করে দিল। নিরুপায় মৃত্যু-যন্ত্রণার তীব্র চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হলো। শকুনি ধীরে ধীরে মাটিতে শুয়ে পড়ল টান টান হয়ে। দৃষ্টিবিহীন উন্মুক্ত দুই আঁখি নীল আকাশের দিকে স্থির।

হাতির হাওদা থেকে সে দৃশ্য দেখতে পেল দুর্যোধন। ভেতরটা তার শকুনির জন্যে হাহাকার করে উঠল। এই মানুষটা নিঃস্বার্থ-ভাবে নিজের রাজ্য ছেড়ে শুধু তার স্বার্থরক্ষার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। এত বড় মহাপ্রাণ মানুষকে সে কি দিল?—মৃত্যুর যন্ত্রণা আর অশেষ দুঃখ। অনুতাপ, অনুশোচনার এক জ্বালাধরা অনুভূতিতে তার বুকের ভেতর জ্বলতে লাগল। চোখ ভরে জল নামল। নিরুচ্চারে বলল: মাতুল, সারাজীবন শুধু আমার সুখের কথা ভেবেছ। এমন কাজ নেই আমার জন্যে যা করনি তুমি। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলে কি? আমাকে একা রেখে চলে যাচ্ছ তুমি। সারা ভারতে আমার বন্ধু বলতে কেউ থাকল না। আমার ভাগ্যটাই মন্দ।

মাতুলকে শেষ সম্মান দেখানোর জন্যে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ভীম আর অর্জুন তাকে ঘিরে রেখেছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে লাগল তাকে লক্ষ্য করে। এক পাও সে এগোতে পারল না। তীরের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। শরীরের বহু জায়গায় ক্ষত হলো। রক্ত ঝরতে লাগল। ধনুর্বাণে সে পারদর্শী নয়। আক্রমণ এড়াতে কেবলই পিছু হটতে লাগল।

বহু সৈন্য নিহত হলো। অনেক সৈন্য আহত হলো। সৈন্যদের যুদ্ধ করার মনোবল ছিল না। মৃত্যুভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল তারা। কোলাহলের ভেতর অনেককে চেঁচিয়ে বলতে শুনল দুর্যোধন—কত যুদ্ধ আর আমরা করব?

কপাল চাপড়ে কেউ কেউ কাঁদছিল: আর কতো সইব বিধাতা? রাজাকে সুবুদ্ধি দাও। ঘরে ঘরে শোকের কান্না। তোমার নিজের ঘরেও হাহাকার। তা-হলে এ যুদ্ধ আমরা কার জন্যে, কেন করছি? এ যুদ্ধে আমাদের লাভ কি?

যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহল ও আর্তনাদের ভেতর কথাগুলো তারা চেঁচিয়ে বলল। সব কথা দুর্যোধন ভালো করে বুঝতে পারল না।

সৈন্যদের যে মনোবল ভেঙে পড়েছে দুর্যোধন তা টের পেল। প্রত্যেকে গা বাঁচিয়ে যুদ্ধ করছিল আর পিছু হটছিল। তাদের উদ্দীপিত করতে বলল : ক্ষাত্রিয়ত্ব মানে যুদ্ধ। ক্ষাত্রিয়ত্বের আর এক নাম মৃত্যু। যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করা ক্ষাত্রিয়ের আশীর্বাদ। আজ আমরা মরণপণ যুদ্ধ করব। হারব, তবু হটব না। শল্যের সৈন্যেরা রক্তের নেশায় হন্যে হয়ে উঠেছে। অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, কৃপাচার্যও যুদ্ধে বিরত নেই। ওদের সৈন্যেরাও সংহারে মেতে উঠেছে। কেবল তোমরাই ভয়ে পিছু হটছ। ক্ষত্রিয় বীর যুদ্ধে ভয় পায় না। অমরত্ব যদি কোথাও থাকে, আছে যুদ্ধে বীরের মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার শক্তি ও সাহসের ভেতরে। তবেই তো পরজন্মের স্মৃতির মুকুরে আমরা অমর হয়ে থাকব। আমাদের দেহ যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, ক্ষতের রক্তে মাটি ভিজে যাবে, তখনই তো দেশের মাটি, মানুষ বলবে—ওগো মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের পুত্রগণ, আমরা তোমাকে ভুলিনি, ভুলব না কোনোদিন। তোমাদের আত্মত্যাগের মশাল আমরা জ্বালিয়ে রাখব। বন্ধুগণ, পুরুষকার বলে আমরা দৈবকে করতলগত করে মৃত্যুপণ লড়াই করে পান্ডবদের বিনাশ করব। কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেলে আমাদের ছেলে-মেয়ে, মা-বোন, বৌ ঘেন্নায় মুখদর্শন করবে না। কোন প্রত্যাশা নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াব? পালিয়েও নিষ্কৃতি পাবে না কেউ। পাণ্ডব সৈন্যেরা পিছু ধাওয়া করে হত্যা করবে। বন্দীদের দাস করে রাখবে। সেই অপমান ভোগ করে বেঁচে থাকার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরব। আমরা হারব, ধ্বংস হব, তবু যতক্ষণ জীবিত আছি, যুদ্ধ করে যাব। নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে, সম্মান বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধনের আহ্বানে এমন একটা জোর ছিল যে সৈন্যেরা উদ্দীপিত হলো। দুর্যোধনও নিজে চমৎকৃত হলো। পরাজয়ের দুশ্চিন্তায়, উৎকণ্ঠায়, স্বজন হারানোর শোক বেদনায় যে হৃদয় পাথর হয়ে গেছিল সেই পাথরের গভীরে অগ্নিময় ক্রোধ আর প্রতিশোধস্পৃহা আগ্নেয়গিরির লাভার মতো হঠাৎ যেন বেরিয়ে এল তার কণ্ঠে।

হস্তিপৃষ্ঠে থেকে দুর্যোধন শল্যকে দূরে দেখতে পেল। একে-

বারে পাণ্ডব সৈন্যের ব্যূহের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। তার সামনে কালান্তক যমের মতো যুধিষ্ঠির দাঁড়িয়ে। শুধু এই মানুষটা নিহত হলে তারা জয়ী হবে। কিন্তু শল্য যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করছে না। হাঁ-করে শল্য দেখছে কি? শত্রুকে এমন অবাক হয়ে দেখার কি আছে? শল্য হাতে তীর ধনুক তুলে নিচ্ছে না কেন? কী হলো শল্যের? যুধিষ্ঠির তাকে মন্ত্র করল কি?

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। যুধিষ্ঠির আগে শর নিক্ষেপ করল। দুর্যোধনের রাগ হলো ভীষণ। নিজের মনে দুর্যোধন গজরাতে লাগল। বলল: মদ্ররাজ, চিরদিন তুমি বোকা থেকে গেলে। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার এই চিত্ত দুর্বলতার কোন মানে হয় না। পৃথিবীতে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ক্ষমতা অনুরাগের কানাকড়ি দাম নেই। স্নেহবৎসল পিতামহ ভীষ্মকে তা-হলে অর্জুন বর্বরের মতো হত্যা করত না। যুধিষ্ঠির আচার্য দ্রোণকে পুত্র নিহত হওয়ার মিথ্যে সংবাদ দিয়ে হত্যা করার চক্রান্ত করতে পারতো না। এ সব দুর্বল মানুষের জন্যে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির দুর্বলতার কোন স্থান নেই। ভুলে যাও তুমি ওদের মাতুল। ওরা তোমার আত্মীয়। যুধিষ্ঠিরের বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে কোন সন্ধি হয় না। ওর কপটতার জবাব দাও। নিষ্ঠুর হাতে ওকে মার। মার। মরণপণ এ যুদ্ধ—একজনের জয়ে এবং আর একজনের নিধনে যার শেষ। যে পক্ষ জিতবে এবং বাঁচবে, হস্তিনাপুর এবং ইন্দ্রপ্রস্থ হবে তার।

কেশর ফোলা সিংহের মতো শল্য গর্জন করল। কিন্তু তার আক্রমণ ছিল এলোমেলো। যুধিষ্ঠিরকে বিপন্ন দেখে নকুল সহদেব তাকে সাহায্য করতে পাশে এসে দাঁড়াল। দুই চোখ তাদের প্রতিহিংসায় জ্বল জ্বল করতে লাগল। শল্য মরিয়া হয়ে উঠল তার আক্রমণে। অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে শল্য পাণ্ডবদের রথের প্রবেশপথ অবরোধ করল। উভয় পক্ষের অশ্বগুলির ধাক্কা-ধাক্কি, ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। শল্যও তার রথ সামলাতে একটু ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক ছিল। সেই সুযোগ যুধিষ্ঠির শল্যকে লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে লাগল। ঝাঁঝরা হয়ে গেল শল্য।

মুহূর্তে রণক্ষেত্রে এক দারুণ বিপর্যয় দেখা দিল। শল্যের বাহিনী কী করবে স্থির করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিল। মুহূর্তে রণক্ষেত্র ফাঁকা হয়ে গেল। চারদিকে ধুলোর ঝড়। মানুষ দেখা যাচ্ছিল না। দুর্যোধন মাথা চাপড়ে আর্তনাদ করে উঠল : হায়রে ভাগ্য! মানুষ ভাগ্যের হাতে পুতুল। সেই পুতুল নিয়ে খেলা করে বিধিলিপি, মানুষ নয়। পুরুষকারের সাধ্য নেই দৈবের বিধান উল্টে দেয়। দৈব আমার জয়ের পথে বাধা। তবে কোন ভরসায় আর যুদ্ধ করব? চিরশত্রু যুধিষ্ঠিরের হাতে বন্দী হয়ে অপমান ভোগ করার চেয়ে পালানো ভালো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো কোন দোষের নয়। পালানো মানে পরাজয়কে অস্বীকার করা। পালানো মানে যুদ্ধকে জিইয়ে রাখা। পুনরায় যুদ্ধ করার জন্যে যতদিন লাগে লাগুক, জীবন কেটে যায় তো যাক। তবু তো প্রতিশোধ গ্রহণের পথ খোলা রইল। পাণ্ডবেরাও সর্বক্ষণ যুদ্ধাতঙ্কে থাকবে। বিজয়ের গৌরবতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে। সে পালালে এ যুদ্ধ শেষ হবে না এখানে। যতক্ষণ তার মৃত্যু না হচ্ছে, নশ্বর দেহ মাটিতে না লুটোচ্ছে ততক্ষণ এ যুদ্ধ চলবে পাণ্ডবদের মনের অভ্যন্তরে। এও কম লাভ নয়। আত্মসমর্পণের অপমানের চেয়ে অনেক ভালো।

রণক্ষেত্রে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ বোধ করল না দুর্যোধন। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, সঞ্জয়কে কোথাও দেখতে পেল না। গোটা রণভূমি এখন পাণ্ডবদের অবাধ অধিকারে। সেও একা হয়ে পড়ল। পালানো ছাড়া আর কোন পথ দিল না তরে সামনে। দুর্যোধন হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে পলায়মান সৈন্যদের পিছু নিল। অশ্বক্ষুরের উৎক্ষিপ্ত ধুলোরাশির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। তাকেও আর দেখা গেল না।

অপরাহ্ণ।

ধোঁয়ার মতো কালো মিশমিশে একরাশ মেঘ হঠাৎ সূর্যকে ঢেকে দিল। অথচ, একটু আগেও আকাশটা এমন ছিল না। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ঝলমল করছিল চারদিক। আলো ঝলসাচ্ছিল

কুরক্ষেত্রের রণাঙ্গন জুড়ে।

শল্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কাকতালীয়ভাবে সেই ছবিটা এলোমেলো করে দিল সব। কালো মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। এক ফালি নীল আকাশ কোথাও ছিল না। একরত্তি আলোও না।

অশান্ত অস্থিরতায় দুর্যোধনের ভেতরটা টাটাচ্ছিল।

অনেকটা পথ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। জলপান করতে একটা ঝরণার পাশে থামল। আঁজলা করে প্রাণভরে জল পান করল। অশ্বকেও জলপান করাল। তারপর একটু বিশ্রামের জন্যে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল।

একা থাকলেই তাকে ভাবনায় পায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ভয়ংকর বিপর্যয়কে ভুলে থাকতে পারছিল না। অথচ যুদ্ধ নিয়ে কত প্রত্যাশা ছিল তার। কিন্তু এভাবে যে ভরাডুবি হতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি। একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তার অহংকার ছিল। ভারতবর্ষের অগণিত নরপতি তার পক্ষে ছিল বলে দেমাকও ছিল। অস্ত্রবল, লোকবল, ধনবল এবং বাহুবলের জোরে পান্ডবদের হারিয়ে দেবার উন্মাদনায় উন্মাদ হয়েছিল। পান্ডবদের শক্তিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। যুদ্ধের প্রথম একাদশদিন পান্ডবেরা শুধুই হেরেছে। সৈন্যক্ষয় আর অস্ত্রক্ষয় হয়েছে। বিজয়লক্ষ্মী ছিল কৌরবদের অনুকূলে। যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল তাদের কর্তৃত্ব। তারপর কোথা থেকে কি ঘটে গেল অকস্মাৎ। পিতামহের নিষ্ঠুর মৃত্যু তার ভাগ্যের মানচিত্র বদলে দিল। বিরাট জয়ের আত্মপ্রসাদ বড় দ্রুত বিষাদে মলিন হলো। বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়। তাকে কোনভাবে ঠেকানো গেল না। অনুকূলে যুদ্ধের গতিটা ধরে রাখা শক্ত হলো। বিজয়লক্ষ্মী সহসা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। জয়, পরাজয় হয়ে ফিরে এল।

মাত্র আঠারো দিনে সব শেষ হয়ে গেল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নেই, ছাব্বিশটি রাজ্যের বন্ধু নরপতি নেই, যুদ্ধ করার মজুত অস্ত্রও নেই। কৌরবেরাও নেই। কৌরবপক্ষে বেঁচে আছে মাত্র চারজন। সে, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা। তারা কে, কোথায় আছে দুর্যোধন জানে না। আঠারোদিন ধরে বিরামহীন যুদ্ধে তারাও ক্লান্ত। ক্ষতের ব্যথায়, যন্ত্রণায় কেউ সুস্থ নয়। এ

অবস্থায় পান্ডবদের সঙ্গে কীভাবে পুনরায় যুদ্ধ করবে ভেবে স্থির করতে পারল না দুর্যোধন। আকাশে মহিষ-কালো মেঘ যেমন রৌদ্রকরোজ্জ্বল সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে তেমনি যুদ্ধের ভয়ংকর বিপর্যয়ে তার সমস্ত ভবিষ্যৎটা অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেছে। সেই ভীষণ আঁধার ভেদ করে আশার আলো তার হৃদয়দেশকে আলোকিত করতে পারল না। এক বিমর্ষ ভাবনায় তার চিত্ত বিমূঢ়, অবসন্ন এবং ভারাক্রান্ত।

কিছু ভালো লাগছিল না দুর্যোধনের। আবার মাটি ছেড়ে উঠতেও ইচ্ছে করল না। সম্মুখে উঁচু নিচু পর্বতমালার উপর তার দু'চোখের বোবা দৃষ্টি স্থির। সে কিছুই দেখছিল না। কেবল চেয়েছিল। মনের ভেতর একটা কথাই ঘুরে ঘুরে আবর্তিত হতে লাগল—একজন মানুষ জীবনভর যাই গড়ে তুলুক না কেন তার দু'হাতের মেহনতে কিংবা বুদ্ধির দোষে তা বালির প্রাসাদের মতোই ভেঙে পড়ে। নিজের কৃতকর্মের সব দায় তাকে একাই বহন করতে হয়। নিজের ভুলের এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাকে একা। ভেবেচিন্তে তাকে একাই স্থির করতে হয় বাকি জীবনটা কি করবে ?

কিন্তু মাঝে মাঝে জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যা সব ভাবনা, চিন্তাধারা ওলট পালট করে দেয়। হঠাৎ অপরিকল্পিতভাবে মোড় ঘুরে জীবনের গতি ছুটে চলে অজানা উপসংহারের সন্ধানে। ক্ষণিকের নির্ণয়ন যে অনাগত কালকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা তখন ভাবনার বাইরে। এমন কি সে মুহূর্তটিকে সনাক্ত করাও অসম্ভব হয়। দুর্যোধনের জীবনেও সেরকম অনেক মুহূর্ত এসেছে বিনা পূর্বাভাসে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে সেই যে চক্রান্ত এবং শত্রুতার শুরু ; তার শেষ হয়নি বলে তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হলো। কিন্তু যুদ্ধটা এরকমভাবে শেষ হবে কল্পনাও করেনি। অবশ্য ভাবলে তো আর যুদ্ধ হতো না। আসলে সব মানুষই তার অদৃষ্টের কাছে অসহায়।

দুর্যোধনের আশ্চর্য লাগে—ভাগ্য মানুষকে এক হাতে দেয়, অন্য হাতে নিয়ে নেয়। ভাগ্যের উপর মানুষের হাত নেই। মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপরে তা নির্ভর করে না। ভাগ্য ফেরাব

মনে করলেই ফেরে না। ভাগ্য নিজের মর্জিতে চলে। প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে দুর্যোধন তো জন্মের সূতিকা গৃহ থেকে লড়াই করছে। ভাগ্যকে জয় করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল কি? তার দুর্ভাগ্য পান্ডুপুত্রের রূপ ধরে হস্তিনাপুরে অকস্মাৎ ঢুকে পড়েছিল। তার সব ঝগড়া তো পান্ডবদের সঙ্গে। মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। রাজ্যের ভাগ-বাটোয়া নিয়েই মূলত সংঘর্ষ। মুখো-মুখি অস্ত্র হাতে লড়াই করে যে জিতবে সে হবে কুরুজাঙ্গালের অধীশ্বর। দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত দুর্যোধন বহিরাগত পান্ডব সন্তান নামধারী কৌন্তেয়দের হাতে তুলে দেবে না হস্তিনাপুর। সে জন্যে যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। এ যুদ্ধ তো তারই পরিণতি। যুদ্ধটা যদিও কৌরব-পান্ডবদের ছিল, তবু যুদ্ধ ছিল মূলত ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মের। যে জিতবে তার কর্তৃত্ব, প্রাধান্য অন্যে মেনে নেবে। তাই, এ যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ। গোটা ভারতবর্ষের দু'পক্ষের সমর্থকরা কৌরব-পান্ডবদের বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল। যেহেতু যুদ্ধটা বেঁধেছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মের কর্তৃত্বের। তাই, কোন রাজ্যের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয়নি। এ ছিল সবার অস্তিত্ব এবং আদর্শ রক্ষার সংগ্রাম। সকলের স্বার্থ ছিল এ যুদ্ধে। তবু এর সব দোষ-অপবাদ, হতাশা, ব্যর্থতা, যন্ত্রণা—একা দুর্যোধনকে বহন করতে হলো।

একা থাকলেই এসব কথা মনে হয়। আর তখনই মনটা ভীষণ ভার হয়ে যায়। ভেতরটা অস্থির লাগে।

সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এল। পৃথিবীর সব আলোর উপর একটা অদৃশ্য হাত যেন কালো পর্দা টাঙানোর আয়োজন করছিল।

বিদায় নেবার আগে দুর্যোধন শেষবারের মতো ক্লান্ত অবসন্ন বিকেলের দিকে চেয়ে রইল। কমলা রঙের আলোয় অপূর্ব দেখাচ্ছিল পাহাড়ের চূড়া, গাছের পাতা, সবুজ প্রান্তর। স্তব্ধ হয়ে কয়েকটা মুহূর্ত একা ভাবল। তারপর অশ্বকে রজ্জুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিল। আর সে পায়ে হেঁটে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে।

হেমন্তের অমাবস্যার বিকেলের হলুদ রোদ গায়ে মেখে দুর্যোধন লোকালয়হীন নির্জন, উঁচুনিচু, দুর্গম পাহাড়ী পথ ধরে হাঁটছিল। পান্ডবদের নিযুক্ত গুপ্তচরদের সন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে এর চেয়ে ভাল এবং নিরাপদ পথ ছিল না। অরণ্যের মতো নিরাপদ জায়গা পৃথিবীতে আর নেই। পান্ডবেরা জীবন দিয়ে এই সত্যটা উপলব্ধি করেছিল। তাই নিরাপত্তার জন্যে অরণ্যকে বেছে নিয়েছে সর্বদা। জীবনের বেশির ভাগ সময়টা তারা নিরাপত্তার কারণে অরণ্যেই কাটিয়েছিল। যখনই কোন সংকট দেখা দিয়েছে তখনই অরণ্যে গেছে আত্মগোপন করতে। অরণ্য শুধু তাদের নয় সকলকে আশ্রয় দেয়, খাদ্য দেয়, আত্মগোপনের জায়গা দেয়। অরণ্য কোনদিন পান্ডবদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। অরণ্যই বোধহয় পান্ডবদের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল।

বারণাবতের ঘটনা মনে পড়ল। যুধিষ্ঠির যুবরাজ হওয়ার পরে পান্ডবেরা বুঝল হস্তিনাপুরে থাকা নিরাপদ নয়। কারণ, তাদের কেন্দ্র করে সহানুভূতির যে হাওয়া ছিল তা যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে দুর্যোধনের দিকে ঘুরে গেল। হস্তিনাপুরের সাধারণ নাগরিকরাও একজন বহিরাগত পান্ডব নামধারী ব্যক্তিকে তাদের শাসকরূপে দেখতে চাইল না। শাসক হওয়ার সঙ্গে রাজ্যের অধিবাসীদের স্বার্থ, জাতীয় ভাবাবেগ এবং নাগরিক মন যুক্ত থাকে। তাই যুধিষ্ঠির যুবরাজ হলে, তারা প্রকাশ্যেই বলতে লাগল: পান্ডব নামধারী ঐ পাঁচজন কে? হস্তিনাপুরবাসীর সঙ্গে ওদের সম্পর্কই বা কি? ওদের জন্মের কোন সংবাদই হস্তিনাপুরবাসী জানে না। পান্ডু বেঁচে থাকতে ওরা হস্তিনাপুর দাবি করল না কেন? পান্ডুর প্রাণহীন দেহ দেখালে কি প্রমাণ হয়ে যায়—ওরা পান্ডুর পুত্র?

ওদের জন্মের ভেতর যে একটা লুকোচুরি ছিল জনতা টের পেয়েছিল। নিজেদের ভেতর তারা বলাবলি করল, পান্ডব নামধারী বহিরাগতদের জারজ পরিচয় পাছে ফাঁস হয়ে যায় তাই কুন্তী তৈলাধার করে পান্ডুর শব আনল হস্তিনাপুরে। রাজপরিবারকে এক অস্বস্তিকর অবস্থার ভেতর টেনে এনে কুন্তী কার্যত তার পুত্রদের স্বীকৃতি আদায় করে নিল। অশিক্ষিত নির্বোধ জনতাও তার কৌশল হৃদয়ঙ্গম করল। কুন্তী অবৈধ সন্তানের জননী এই

কথাটা চাওর হয়ে গেলে রাজপরিবারের সুনাম হানি হবে। তাই, পিতামহ তাড়াতাড়ি করে বহিরাগতদের পান্ডুপুত্র বলে মেনে নিল। লোকের সন্দেহ দূর করার জন্যে হস্তিনাপুরে তাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু সাধারণ প্রজার মনে সন্দেহটা বিঁধে রইল।

সন্দেহটা প্রতিবেশী বন্ধুরাজ্যগুলির মধ্যেও প্রবল হলো। কিন্তু হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে যে গোপন ষড়যন্ত্র হলো তাতে পান্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ না করে উপায় ছিল না ধৃতরাষ্ট্রের। ধৃতরাষ্ট্রদের মতো হস্তিনাপুরের বন্ধুরাজ্যগুলিও এই চক্রান্তকে ধিক্কার দিল। বহিরাগত পান্ডবেরা যে পর্বতবাসী রাজন্যবর্গের মনোনীত মতলববাজ রাজনৈতিক প্রতিনিধি তাতে কারো সন্দেহ ছিল না। পাণ্ডুপত্নীদ্বয়ের গর্ভে পার্বত্যরাজারা আপন আপন পুত্র সৃষ্টি করে হস্তিনাপুরে পাঠিয়েছে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে। কথাগুলো এতবেশী আলোচনা হতে লাগল যে, পান্ডবেরা নিরুপায় হয়ে ঐ মুখরোচক আলোচনা বন্ধ করতে তাড়াতাড়ি হস্তিনাপুর ত্যাগ করল। বারণাবতের অরণ্যকে বিনোদনের স্থানরূপে নির্বাচন করল।

কারণ, অরণ্য হলো গোপন কার্যকলাপের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং নিরাপদ জায়গা। এখানকার কোন কথাই বাইরের পৃথিবীতে পেঁছয় না। বারণাবতের জঙ্গলে বসেই পান্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং শাসনমুক্ত হস্তিনাপুরের মসনদ দখলের এক গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হলো। ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা নিখুঁত করতে কত ভাবনা-চিন্তা করেছিল। তাদের আত্মপ্রকাশের আগে তার বিন্দু-বিসর্গ জানত না কেউ। জানবে কোথা থেকে ? একটা ধাঁধা সৃষ্টি করে তারা অন্তর্ধান করল। বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে পাঁচজন দরিদ্র এবং খেতে না পাওয়া জংলী যুবক এবং তাদের জননীকে ভোজে আপ্যায়িত করল। প্রচুর সুরাও দিল। সুরাপ্রভাবে যখন তারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলো তখন ভীম দ্বার রুদ্ধ করে গৃহেতে অগ্নিসংযোগ করল। পাছে লোকচক্ষে তাদের অন্তর্ধান জানাজানি হয়ে যায় তাই বাসগৃহের অভ্যন্তরে আগে থেকেই এক গোপন সুড়ঙ্গ খনন করেছিল। ঐপথেই গৃহ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এল তারা। বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডের ভস্মস্তূপ থেকে পাঁচটি পুরুষ ও

একজন রমণীর দগ্ধ দেহ উদ্ধার হলো। তারা পঞ্চপান্ডব এবং কুন্তী বলে প্রত্যয় জন্মাল। পান্ডবদের মৃত্যুসম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ থাকল না। পান্ডবদের সঙ্গে দুর্যোধনের বনিবনা ছিলনা বলে সহজেই সন্দেহের লক্ষ্য হলো সে। দোষী না হয়েও পান্ডবদের রহস্যময় মৃত্যুর সব দোষ বহন করতে হলো তাদের।

ছ'টি ঋতুর শেষে পাঞ্চালে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে তারা যখন আত্মপ্রকাশ করল সব রহস্য তখন প্রকাশ হলো। এই সময়টা তারা অরণ্যে অরণ্যে শুধু ঘুরে বেড়াল না, আত্মপ্রকাশের জমি প্রস্তুত করতে বিভিন্ন রাজশক্তির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ গড়ে তুলল। হস্তিনাপুরের চিরশত্রু পাঞ্চাল নরেশ দ্রুপদ তাদের আত্মপ্রকাশের দিকে নজর রেখেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা করল। সফল প্রতিযোগী কর্ণকে লক্ষ্যভেদ থেকে বঞ্চিত করে তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করলে ব্রাহ্মণবেশী অজ্ঞাতকুলশীল অর্জুন কিছুতেই বীর্যশুল্কা দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করত না। স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ভারতের অগণিত নরপতিদের সামনে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে প্রমাণ করল যে ব্রাহ্মণবেশী তরুণই অর্জুন। আর স্বয়ম্বর সভায় বিক্ষুব্ধ নরপতিদের বিক্ষোভ যে একাই সামলাচ্ছিল সে মধ্যমপাণ্ডব ভীম। বারণাবতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পাণ্ডবেরা যে নিহত হয়নি এই রহস্যটি নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেল।

স্বয়ম্বরসভা ছিল পাণ্ডবদের জীবনে আশীর্বাদ। নির্বান্ধব, সহায়হীন পাণ্ডবেরা রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠায় সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেল দুই আত্মীয় রাষ্ট্রের কাছ থেকে। দ্বারকার কৃষ্ণ নিজে তাদের হয়ে হস্তিনাপুরে দরবার করতে এসেছিল। হস্তিনাপুরের অধিকার নিয়ে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যখন এক রাজনৈতিক সংকট আসন্ন হয়ে উঠল তখন বিবাদ এবং বৈরীতা এড়াতে পিতামহ ভীষ্মই কুরুসাম্রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করে পাণ্ডবদের দাবি পূরণ করল। বারণাবতের জঙ্গলে প্রমোদ ভ্রমণের যাত্রার অনুমতি ধৃতরাষ্ট্র যদি পাণ্ডবদের সেদিন না দিত তা হলে কুরুরাজ্য ভাগাভাগি হওয়ার প্রশ্ন থাকত না।

পাহাড়ী পথের চড়াই উতরাই ভেঙে যেতে যেতে দুর্যোধনের বারংবার মনে হতে লাগল জঙ্গল মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে না।

বরং প্রত্যাশা পূর্ণ করে তোলে। মহারাজ হস্তীর প্রপৌত্র কুরু হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিল জঙ্গলে আত্মগোপন করে।

সহসা পাখির আর্তডাকে দুর্যোধন চমকাল। তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে সেই সময় এক নাম না জানা পাখি গাছের ডালে বসে পাগলের মতো ডাকছিল। হঠাৎই মনে হলো তার বুকের আর্তিই পাখির আর্তনাদ হয়ে যেন দ্বৈপায়নময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। হু-হু করা বাতাস অসহায়ের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে যেন প্রান্তরের বুকে মুখ লুকোল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুর্যোধন পাখির ডাক শুনল। মানুষের মতো পাখিও কাঁদে। তারও একটা মন আছে। সেখানে কত-রকমের যে কষ্ট, ব্যথা, দুঃখ আছে কে জানে? পৃথিবীর সবাই বোধ হয় দুঃখী। প্রত্যেকের দুঃখ কষ্ট, কান্নার অনুভূতিটা আলাদা আলাদা। এই উপলব্ধিই তার বুকের ভেতর সান্ত্বনার বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল। নিজেকে শুনিয়ে মনে মনে বলল, নিজের কাছ থেকে ছাড়া আর কারো কাছে বাহবা কুড়োনোর জন্যে হাততালি চেয়ে নয়। পৃথিবীতে সেই মহান হয়ে থাকে এবং বীরের মতোই মরে যে নিজের সংবিধান নিজে প্রণয়ন করে এবং সেই মতোই চলে।

কথাটা বড় দেরী করে বুঝল দুর্যোধন। সময়ের মধ্যে আত্মদীপ জ্বালিয়ে নিজেকে না দেখলে পরে দীপ জ্বালানোর আর কোন মানে হয় না। বেদনামিশ্রিত বিস্ময়ে সঙ্গে দুর্যোধনের সহসা সেই উপলব্ধি হলো। জীবন দর্শন পূর্ণ হলেই তবেই দার্শনিকতা জন্ম নেয় মনের ঘরে। দার্শনিক উপলব্ধির জন্যে জীবনের অনেক মূল্য দিতে হয়। এই মূল্য দেয়ার অর্থ তো যার যা কৃতকর্মের ফল তাকে তাই ভোগ করতে হয়। জীবন-দর্শনের গায়ে অনেক স্মৃতি, অনেক রক্তক্ষরণের দাগ লেগে থাকে।

সূর্য ডুবছে।

পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে গেছে।

দ্বৈপায়নে যাওয়ার পথেই অকস্মাৎ সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হলো দুর্যোধনের। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর থেকে সেও চুপি চুপি রণে ভঙ্গ

দিয়েছিল। আচমকা দু'জন দু'জনকে দেখে খুব অবাক হয়েছিল। সে দেখার ভেতর রোজকারের দেখা সঞ্জয়কে দেখতে পেল না। এই সঞ্জয় একেবারে আলাদা। দু'চোখে তার অপমানের আগুন, মুখে পরাভবের গ্লানি। নিষ্ফল ক্রোধে ফুঁসছিল ভেতরটা। বলল, যুবরাজ, তুমিও রণক্ষেত্র ত্যাগ করলে! ক্ষোভটাকে সামলে নিয়ে বলল, কী হবে আর যুদ্ধ করে? দমকা হাওয়া তেড়ে আসছে তোমার দিকে। দেমাক করার মতো কী আছে তোমার? সর্বনাশের শেষ দেখাটুকু শুধু বাকি। সেটুকু না দেখে ভালো করেছে। মিছেমিছি মন খারাপ হতো শুধু।

অনুশোচনার গলায় উত্তর দিল দুর্যোধন। সব কেমন স্বপ্ন মনে হয়। হেরে গেছি ভাবলে বুকের ভেতর কাঁটা ফোটার যন্ত্রণার মতো টনটন করে। পরাজিতের বিলাপ, অনুশোচনার মূল্য কি?

রাজন, এযুদ্ধে আমরা এত হারিয়েছি যে, আমাদের হারানোর আর কিছু নেই। সত্যিই আমরা রিক্ত। অদৃষ্ট চিরদিন তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। সারাজীবন প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে তুমি একা লড়েছ। তোমার সব সাফল্য এবং কৃতিত্ব কৃষ্ণের কপটতায় ঢাকা পড়ে গেল। লোকের চোখে তোমাকে অপরাধী করে রাখল। তোমার হারের কথা ভুলে যাও। জীবনে কোন হারই হার নয়, যতক্ষণ একজন মানুষ নিজের কাছে হেরে না যাচ্ছে। নিজে না হারলে কেউ হারাতে পারে না তাকে। সব সময় একজনকে হারতে হয়। কিন্তু সেই হেরে যাওয়াটা কখনো কখনো একজন ব্যর্থ পরাজিত মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় জেতা হয়ে যায়। তোমার গ্রহণ লাগা অদৃষ্টে তা যে হবে না, বলতে পারে কে?

আশ্চর্য এক গভীর কৃতজ্ঞতা এবং ভালো লাগার চোখে দুর্যোধন চেয়ে রইল সঞ্জয়ের দিকে। সঞ্জয়ও হঠাৎ কেমন হয়ে যায়। অভিভূত গলায় বলল, পুত্র দুর্যোধন, কৌরববংশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘকালের। আমার সবচেয়ে গর্ব মহারাজ ধৃত-রাষ্ট্রের সারথি ও মন্ত্রী আমি। আমি সব জানি। কৌরববংশ মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র ঠেকাতে, হস্তিনাপুরের কৌরব আধিপত্য সুরক্ষিত করতে কী কষ্ট করেছে তুমি। এই হারের জন্য তো তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তোমার সামনে মস্তজীবন

পড়ে আছে। সে জীবন তুমি নষ্ট করতে পার না। তুমি হেরে গেলে কিংবা বীরের মতো যুদ্ধ করে রণক্ষেত্রে নিহত হলে এ যুদ্ধের ছবিটা কিছুমাত্র বদলে যাবে না। কিন্তু তুমি না থাকলে পাণ্ডবদের কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতার বদলা নেবে কে? তোমার পুত্র, আত্মীয়, ভ্রাতা, বন্ধুদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তোমার বেঁচে থাকা দরকার। এবং আর একটা নতুন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ কুরুও একদিন পাঞ্চালদের অধিকার থেকে হস্তিনাপুরকে মুক্ত করতে আত্মগোপন করেছিল। আত্মগোপন করা লজ্জার কিছু নয়।

কথাগুলো শেষ করে সঞ্জয় নিরুত্তর দুর্যোধনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নিজের গন্তব্য পথের দিকে চলে গেল।

দুর্যোধনের মনটা ভার হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে তার মনের ভেতর ভানুমতী যেন কথা কয়ে উঠল। কল্পনায় তাকে দেখছিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পুত্রহারা জননী চোখে জল, মুখে কাঠিন্য। ক্ষমাহীন, মমতাহীন এক নারী। দুর্যোধন স্পষ্ট দেখতে পেল ভানুমতী মুখ তুলে নিরুত্তাপ গলায় বলছে, স্বামী, তুমি ছাড়া আমার পুত্রের মৃত্যুর বদলা নেবে কে? তোমাকে আমি হারাতে পারব না। আমার মতো তুমিও সব শোক তাপ নিজের বুকে শুষে নিয়ে পাথর হয়ে গেছ। আর কেউ না বুঝলেও আমি জানি। আমার চেয়ে তোমাকে বেশি কে জানে? আমার সব কান্না বুকে আগুন হয়ে জ্বলছে। ঐ আগুনে পাণ্ডবদের রাজ্য, নগর প্রাসাদ পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত নিভবে না। তোমাকে আমাকে বিচলিত হলে তো চলেবে না। একটা বড় যুদ্ধের জন্যে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। নইলে, এত মানুষের আত্মদানের সান্ত্বনা কী থাকবে? অমন অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছ কি? আজ যা তোমার অভ্রান্ত পরাজয় বলে বোধ হচ্ছে, কাল যে তা বড় জয় হয়ে ফিরে আসবে না তা কি বলতে পারে কেউ? পাণ্ডবদের আপাত জয়টা অধর্মের। সেই সত্যটা প্রমাণের দায়; ধর্মে যে বিশ্বাস রাখে তার। হয়তো এমন না হলে সকলের জীবন এক নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে যেত।

দুর্যোধন অবাক চোখে চেয়েছিল ভানুমতীর দিকে। বিস্ময়ে তার পলক পড়ছিল না। চিরচেনা ভানুমতীকে তার অচেনা লাগল। কারো কোন জানাই বোধহয় অভ্রান্ত নয়। ভানুমতীও হঠাৎ তার জানার জগৎটা বদলে দিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। হতভম্বের মতো বলল, রানী, আমি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি। যা সত্যি হবার নয়, তোমার কথাগুলো যেন তাই হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু সত্যি কি তাই হয়? যে আজ সব হারিয়ে, সব খুইয়ে ভিখারী হয়ে গেছে, রাজার পোশাক পরে থাকলে তার ভেতরের দৈন্য যায় কি? তার ব্যর্থতা, অপমান, লজ্জা, পরাজয়ের গ্লানি কি তাতে বদল হয়? বোধ হয় সহজ নয় অত। রানী, বেঁচে থাকার মধ্যে যদি তেমন জৌলুস নাই-ই থাকে, তবে মরণে জৌলুস একটু এলে তাও ভালো লাগবে। একটা বড় কিছু, ভালো কিছু করতে গিয়ে গর্বের, স্বপ্নের মৃত্যু হতেই পারে। মাথা নিচু করে দুর্যোধন, বাঁচতে পারল না বলে তো সারাজীবন কষ্ট পেয়েছে। ভানুমতী, নিজের মেরুদন্ডটা সোজা রাখাটা নিজের জন্যে দরকার। বেঁকা হয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে বেঁচে থাকার ভেতরে কোন সুখ নেই। যারা পারে, তারা পারে, কিন্তু দুর্যোধনের বাঁচাটা দুর্যোধনের মতোই হবে।

ভানুমতী দমল না। দুর্যোধনকে স্বমতে আনার জন্যে বলল, প্রতিমুহূর্তে কত হারজিত আছে আমাদের জীবনে। জীবনের শেষে এসে যার জিতের সংখ্যা বেশি—লোকে বলে জিতল সেই-ই। যার হলো না, সে হারল। দুঃখের কথা মানুষ তার হারাটাকেই বড় করে দেখে বলে সবকিছু মূল্যহীন হয়ে যায়। জীবনটা অভিশপ্ত মনে হয়। একবারও ভাবে না, মানুষ তো আর পাশার ঘুঁটি নয় যে তাকে খোপে বসিয়ে দিলে সে আজীবন সেখানে বসে থাকবে। সে যে সতত চলমান। তার রক্তে আছে গতি, স্থান পরিবর্তনের নেশা, এই অমোঘতা সে সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। তুমি তার ব্যতিক্রম নও। জীবন মানে জীবিত থাকার চেষ্টা। অভিমান নিয়ে চলে যাওয়ার ভেতর কোন পৌরুষ নেই।

ভানুমতী! মুখ বিকৃত করে দারুণ কষ্টে উচ্চারণ করল দুর্যোধন। তার অন্তরের তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে উৎসারিত

হলো ডাকটা। ভানুমতীর কথাগুলো জলপ্রপাতের শব্দের মতো তার দু'কান ভরে রইল। মনে হলো পৃথিবীটা বদলে গেছে, কেবল বদলায়নি সে। সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলে যে চলতে জানেনা সে সত্যিই বাঁচতে শেখেনি। যেমন তেমন করে বাঁচা নয়, বাঁচার মতো বাঁচতে তারাই পারে যারা মস্তিষ্কের আলোয় ধার দিয়ে বুদ্ধিকে শানিয়ে তোলে। নইলে, ইচ্ছেটা বীজের মতোই সুপ্ত থাকে, ফুল হয়ে ফোটে না।

কথাগুলোর ভেতর এমন একটা সুগন্ধ ছিল যে, দুর্যোধনের মন আকুল হয়েছিল। সে অনুভূতি প্রকাশ করার নয়। ভাববার শুধু। কোন হঠাৎ আসা অবসরের মুহূর্তে অথবা এরকম কোন সংকটে পড়লে কথাগুলোর সুগন্ধের মধ্যে নাক ডুবিয়ে জীবনকে ভালোবাসার তীব্র তাগিদ বুকে জাগে। সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়ে। শল্যের মৃত্যুর পরে সেই অনুভূতি তার হয়েছিল। ভানুমতীর কথাগুলো তার বুকের ভেতর লাফাচ্ছিল। বার বার মনে হতে লাগল শৌর্য-বীর্যের আস্ফালন দেখিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়া কোন শক্ত কাজ নয়। এটা একটা মহৎ আদর্শের ব্যাপার। কিন্তু যে যুদ্ধে ধর্মের নামে অধর্ম হয়েছে অবাধে—সে যুদ্ধে আদর্শের জন্যে, সত্যের জন্যে প্রাণ দেয়া হঠকারিতা। ভানুমতীর ভাষায় জীবন মৃত্যুর চেয়ে বড়। বেঁচে থাকলে যে সব ফিরে পাওয়া যায় পান্ডবেরা অজ্ঞাতবাসে থেকে তা প্রমাণ করেছে প্রাণে বাঁচলে একজন ব্যর্থ মানুষের সফল হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। পুত্র, বন্ধু, আত্মীয়দের মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে মরলে তাদের অতৃপ্ত আত্মা কোনদিন তাকে ক্ষমা করবে না। এবং সেও বিবেকের কাছে, সত্যের কাছে, ধর্মের কাছে চির অপরাধী হয়ে থাকবে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে ভানুমতীর পরামর্শ মতো দ্বৈপায়নেই আত্মগোপন করবে।—চিরদিন সে জয় চেয়েছে। জীবনে জেতাটা বড় কথা। কে কিভাবে জিতল জয়ের পরের দিনগুলিতে সে কথা কেউ মনে রাখে না। জয়টাই লোকের মনে থাকে। জিতে প্রমাণ করবে দুর্যোধন কাপুরুষ নয়, ভীরু নয়। দুর্যোধন পলাতক নয়। একটা বড় যুদ্ধের স্বার্থে গা ঢাকা দিয়েছে। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে সে একটু সময় নিচ্ছে। আর সেজন্যেই আত্মগোপন করা বিশেষ

দরকার। লোকে যা খুশি এখন ভাবুক, বিরাট জয়ের পর সব জল্পনা কল্পনার অবসান হবে।

সহসা পেঁচার ডাক শুনল দুর্যোধন। পেঁচানী সে ডাকে সাড়া দিল গদগদ কণ্ঠে। হাওয়া ঝরা শুকনো পায়ের তলায় মুচ মুচ শব্দ করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। গা ছমছম করা একটা ভয় তীব্র হয়ে চারদিক থেকে ছুটে আসতে থাকে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে সেই ভীতি ভরে যায়। নিরাপত্তার অভাবজনিত অসহায়তাবোধে তার ভেতরটা ছিন্নভিন্ন হতে লাগল। গভীর করে কিছু ভাবতে পারছিল না। অনুতাপে আবর্তিত হতে লাগল তার ভেতরটা।

দ্বৈপায়ন হ্রদের পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল দুর্যোধন। মাঝে মাঝে কাটা জায়গাটা চেপে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। কষ্টে দু'চোখে তার জল এল। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল। হাঁ করে জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে হাঁটতে লাগল আস্তে আস্তে। চোখে মুখে একটা অব্যক্ত কষ্টের ছাপ ফুটে উঠল। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছিল তার। পড়ন্ত রোদের আলোয় বিন্দু বিন্দু ঘাম মুক্তোর মতো দেখাচ্ছিল।

অন্ধকার নামছিল খুব ধীরে। পৃথিবীর সব আলোর উপর কে যেন আস্তে আস্তে একটা কালো পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে। আর আকাশ থেকে ঝরে পড়া হলুদ আলোয় দ্বৈপায়নকে অপরূপ দেখাচ্ছে। ছোট বড় দেউদার গাছগুলো হ্যাংলা চোখে আকাশের রঙের খেলা দেখছে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ নীল জলে লাল রঙে রাঙানো আকাশ যেন সঙ্গমসুখে মেতে উঠেছে। আর দ্বৈপায়ন লাজুক বধুর মতো সরমে রাঙা হয়ে গেছে। অগভীর হ্রদের তলদেশ পর্যন্ত আরক্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে যেন। মাছের ঝাঁক রুপালী ঝলক তুলে স্বচ্ছন্দে ঘুরছে, খেলছে। মাছ রাঙা পাখি শিকারের আশায় তখনও গাছের ডালে ওৎ পেতে বসে আছে। এক হাঁটু জলে পা ডুবিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা সাদা বক। জলের ধারে ধারে কত রঙের পদ্ম, কুমুদ ফুটে আছে। পাড়ে বাঁধা প্রমোদ তরী মৃদু তরঙ্গের শিহরণের চমকে

চমকে উঠছে। হ্রদের চার ধারে সাজানো সুন্দর উদ্যান। ভূস্বর্গের বিস্ময়।

কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি দিল। পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার আগে শেষ বারের মতো ক্লান্ত, অবসন্ন বিকেলের দিকে করুণ চোখে চেয়ে রইল। নেভা আলোয় ঔজ্জ্বল্য ছিল না। কমলা রঙের আলোয় অপূর্ব দেখাচ্ছিল গাছের পাতা, হ্রদের জল, কাঁকরে রাঙানো লাল প্রান্তর।

দিনের আলো নেভার মুখে দুর্যোধন দেখল দ্বৈপায়নের হ্রদের জলে গা ডুবিয়ে কয়েকজন ব্যাধ স্নান করছে। পাছে তাদের দৃষ্টি পড়ে তাই তাড়াতাড়ি ঝড়ে ভেঙে পড়া একটা মোটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকোল। কিন্তু তার দুটি চোখ পেতে রাখল তাদের গতিবিধির উপর।

গাছের গুঁড়ি ধরে দুর্যোধন চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত সময় বয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে।

তবু ব্যাধেরা জল ছেড়ে উঠছে না। তাদের অস্তিত্ব অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে। দুর্যোধনের চোখ দুটো আকাশের তারার মতো অন্ধকারেও মানুষগুলোকে দেখছিল। অনুভূতির ঘরে ঘরে দীপ জ্বালিয়ে ওই লোকগুলোর অভিসন্ধি বোঝার চেষ্টা করল। ওরা ব্যাধ নয়; ব্যাধের ছদ্মবেশে গুপ্তচর। তার গতিবিধির উপর নজর রাখতে যুধিষ্ঠির সর্বত্র চর নিয়োগ করেছে। দ্বৈপায়নও তার সাবধানী দৃষ্টি থেকে বাদ যায়নি। এই স্থানটি যে তার অত্যন্ত প্রিয় তার সুখ দুঃখের জায়গা যুধিষ্ঠির তা জানে।

লোকগুলোকে দেখা থেকে কিছু ভালো লাগছিল না দুর্যোধনের। নিজেকে ভীষণ বিপন্ন এবং অসহায় লাগল। এত একা এবং নিঃসঙ্গ লাগল যে, কান্না পেল। এই মুহূর্তে ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারলে হয়তো তার সব যন্ত্রনা, কষ্ট এবং একাকীত্ব একটু লাঘব হতো।

অন্ধকারেও দুর্যোধনের প্রতি ইন্দ্রিয় সজাগ। ভিতরে নির্দ্দেশ শোনার প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ। অশান্ত অস্থিরতা এলোমেলো করে

দিচ্ছিল তার সব ভাবনা।

একটা ভীষণ ভয় দুর্যোধনকে পেয়ে বসেছিল। পাছে অন্য কোন গুপ্তচর দেখে ফেলে, তার অবস্থান টের পায় তাই গাছের গুঁড়ির আড়াল ছেড়ে বেরোতে সাহস হলো না। আপাতত এটাই নিরাপদ আশ্রয়।

রাগে দুর্যোধনের সর্বশরীর জ্বলছিল। একবার ইচ্ছে করল লোকগুলোকে হত্যা করে দুর্ভাবনা দূর করে। পরক্ষণেই সাবধানী মনটা সতর্ক করে দিল। ভুল করার সময় নয় এখন। মৃতের গায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখে পাণ্ডবেরা সহজেই শনাক্ত করবে তাকে। এবং দ্বৈপায়নে তার অবস্থান টের পেয়ে যাবে। তাতে বিপদ হতে পারে। লোকগুলো অন্ধকারে তাকে চিনেছে কিনা —তাদের হাবভাব দেখে বোঝার উপায় ছিল না। হঠকারিতা করলে লাভের চেয়ে ক্ষতি হবে ভেবে সংযত করল নিজেকে।

মশার কামড় সহ্য করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। অন্ধকার গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত এভাবে থাকতে হবে তাকে।

রাত মানেই ভয় করা আর ভয় পাওয়ার সময়। যদিও এই ছোট্ট জায়গায় সে হাঁফিয়ে উঠেছিল তবু তো অস্তিত্ব নিয়ে কোন-ক্রমে বেঁচে আছে। বেঁচে থাকাটা এক অন্য ব্যাপার। এমন করে আগে বুঝেনি।

অন্ধকার আস্তে আস্তে গভীর হলো। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল একটানা। সেই ডাক মাঝে মাঝে ছিদ্রিত হচ্ছিল একটা ভয় পাওয়া কালো পেঁচার ডাকে। ভয় লাগানো গম গমে ডাকে নিথর মৌন হ্রদের জল চমকে চমকে উঠছিল। অন্ধকারে দ্বৈপায়নের ব্যাপারটাই বদলে গেল।

হেমন্তের কৃষ্ণাচতুর্দশীর গাঢ় অন্ধকার। আকাশে তারাদের মরা আলো; শিশির আর কুয়াশার সঙ্গে মিলে এক দুর্বোধ্য আড়াল রচনা করল। অন্ধকারের মধ্যে লোকগুলোর হদিশ খুঁজে পেল না দুর্যোধন। বড় বড় গাছগুলো তাকে ঘিরে নীরব প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল।

চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে দুর্যোধন হ্রদের জলে পা রাখল। জলে ঢেউ উঠল না, শব্দ হলো না—সন্তর্পণে গা ভাসিয়ে

দ্বীপে উঠল। সুড়ঙ্গে ঢুকল।

ব্যাধবেশী লোকগুলো তখনও ছিল। দুর্যোধনের অন্তর্ধান তারা দেখতে পেল না। কিন্তু আধ-অন্ধকারে তাকে ঠিক চিনেছিল। সারারাত দ্বৈপায়নে জেগে কাটাল তারা।

এই অবকাশে হাজার বছরের উজান ঠেলে দ্বৈপায়নের গল্পটা একটু বলে রাখি। দ্বৈপায়ন হ্রদের তলদেশে গুপ্তকক্ষের সন্ধানটা কেবল দুর্যোধনের জানা ছিল। প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস ঘাটতে ঘাটতে একদিন ঐ গুপ্তকক্ষের সন্ধানটা জানতে পারল।

দ্বৈপায়ন প্রাকৃতিক হ্রদ নয়, মানুষের সৃষ্টি। পুরুবংশের রাজা এবং হস্তিনাপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ হস্তি এই হ্রদ খনন করেছিল। বিশ্রামের জন্যে এবং দুর্দিনে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে হ্রদের মধ্যে দ্বীপের মাটিগর্ভে গুপ্ত গৃহ নির্মাণ করেছিল। বাইরে থেকে ঐ গৃহ বোঝার কোন উপায় ছিল না।

হস্তির রাজত্বকালে পৌরবরাজ্য সপ্তসিন্ধু থেকে গঙ্গার পশ্চিম পার পর্যন্ত ছিল। রাজ্য সীমানার দক্ষিণ দিকে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল যাদবদের। প্রভূত শক্তির অধিকারী তারা। রাজ্যসীমার খুব কাছাকাছি তাদের অবস্থান হওয়ায় উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনা নিয়ে হস্তিকে দিন কাটাতে হতো। অপরপক্ষে, পুত্রবর আজমীঢ়ের প্রথমা স্ত্রী যাদবকন্যা নীলিনীর গর্ভের পাঁচ দুর্দান্ত ছেলে হয়ে উঠল গোটা পরিবারের দুর্ভাবনা। হঠাৎ-ই হস্তিনাপুরের সঙ্গে তারা সব সম্পর্ক ছিন্ন করে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী অংশে পাঁচ ভাইর অধিকৃত রাজ্যগুলি একত্র করে বিশাল রাজ্য স্থাপন করল। এই রাজ্যই হলো পাঞ্চাল। হস্তিনাপুরের উপর তাদের প্রবল রাগ এবং বিদ্বেষ। বৃদ্ধ হস্তি তাই নিরাপদ আশ্রয়ের নিমিত্ত দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যবর্তী দ্বীপে মাটির গর্ভদেশে গৃহ নির্মাণ করল।

হস্তির প্রিয় জায়গা এবং সুখ দুঃখের একান্ত সঙ্গী দ্বৈপায়নের ভূগর্ভস্থ গৃহের যখন সন্ধান পেল তখন দুর্যোধনের বয়স ত্রিশ। হস্তিনাপুরের এক পারিবারিক সংকট মুহূর্তে আশ্চর্যভাবে দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যস্থিত দ্বীপের ভূগর্ভে গুপ্তকক্ষের

অবস্থিতি যখন জানতে পারল ঠিক তখনই পাঞ্চাল থেকে পাণ্ডবেরা দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদীর সঙ্গে হস্তিনাপুর প্রবেশ করল। এ দুয়ের ভেতর কোথায় যেন এক সম্পর্ক সূত্র আছে দুর্যোধনের মনে হলো। অতীতের গভীরে গভীরে দুর্যোধন পাঞ্চাল ও হস্তিনাপুরের শত্রুতার শিকড় খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল।

হস্তির পাঞ্চাল ভীতির ছায়া পড়ল চার পুরুষের পর সংবরণের রাজত্বকালে। এই সময় পাঞ্চালরাজ হস্তিনাপুরের বেশ খানিকটা অংশ জয় করে নিল। রাজ্য হারিয়ে পৌরব-রাজ সংবরণ সপুত্র দ্বৈপায়নের গুপ্তকক্ষে আত্মগোপন করল। মাঝে মাঝে লোকে রাজ্যচ্যুত সংবরণকে দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখল। পুত্র কুরু সৈন্য-বাহিনী গঠন করে পাঞ্চালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। কুরু বীর্যবলে পাঞ্চালদের হাত থেকে হস্তিনাপুর উদ্ধার করে পিতাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করল। কিছুকাল পরে পিতার হাত থেকে হস্তিনাপুরের শাসনভার গ্রহণ করল। পুরুর যে বংশধারা কুরু থেকে জন্ম নিল তারা কৌরব নামে পরিচিত হলো। কুরু-পাঞ্চালের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হলো এই সময় থেকে।

পাঞ্চাল বংশের শিকড় ছিল কৌরববংশে। কিন্তু যাদব কন্যা নীলিনীর রক্ত মিশেছিল বলেই রক্তের টানে যাদবদের মতো তারা কৌরবদের সঙ্গে শত্রুতায় অবতীর্ণ হলো। অনুরূপভাবে যাদব-কন্যা কুন্তীও পাঞ্চালদের মতো কৌরববংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুত্রদের সহায়তার এক স্বতন্ত্র বংশধারা সৃষ্টি করল। ফলে, এক নতুন বিরোধের সূত্রপাত হলো পরিবারের অভ্যন্তরে।

চারপুরুষ পরে পাঞ্চালের সঙ্গে কৌরবদের পুরনো বিরোধটা মহারাজ দ্রুপদ কৌশলে পাণ্ডবদের সহায়তায় হস্তিনাপুরের অন্দরমহলে টেনে নিয়ে এল। সংঘাতের গোপন ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই যেন পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডব মিলে বিয়ে করল। কুন্তীই এই বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। তার কারণ একটাই, প্রতিশোধ। হস্তিনাপুরের উপর প্রতিহংসা চরিতার্থ করতে পাঞ্চাল এবং পাণ্ডবেরা জোট বাঁধল। উভয়ের লক্ষ্য এবং স্বার্থ এক। যে কোন উপায়ে কৌরবদের অধিকার থেকে হস্তিনা-

পুরকে ছিনিয়ে নেয়া ছিল তাদের স্বার্থ। উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে কৌরববংশের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি যে কোন উপায়ে খর্ব করা এবং ধীরে ধীরে পাণ্ডবদের কৌরবদের স্থলাভিষিক্ত করা। কাজটা খুব সহজ ছিল না। তাই অনেককাল ধরে ষড়যন্ত্র চলছিল হস্তিনাপুরের ভেতরে ও বাইরে। তার ফলশ্রুতি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের চরম পরাজয় থেকে আত্মরক্ষা করতে দুর্যোধন দ্বৈপায়নের দ্বীপ মধ্যস্থ গুপ্তকক্ষে ঢুকল।

সুড়ঙ্গের সিঁড়ি ধরে কয়েক ধাপ নামতে দুর্যোধন সহসা থমকে দাঁড়াল। মনে হলো শুকনো পাতার উপর দিয়ে সন্তর্পণে কারা চলাফেরা করছে। ফিসফিস করে কথা বলছে। ইন্দ্রিয়গুলো তার টান টান হলো। অজানা আশঙ্কায় ভেতরটা ছটফট করে উঠল। পালিয়েও নিস্তার নেই! পিছু পিছু নিয়তি কি সুড়ঙ্গ পর্যন্ত ধাওয়া করল? একটু আগে যে মনটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলেছিল হঠাৎ-ই দুরন্ত ভয়ে তা বরফের মতো বুকে জমাট বাঁধল। নিশ্বাস বন্ধ করে রইল দুর্যোধন।

বোকার মতো অনুভব করল গাল বেয়ে তার চোখের জল গড়াচ্ছে।

বিস্ময়ে চমকাল দুর্যোধন। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। হঠাৎ-ই মনে পড়ল মসৃণ বড় বড় পাথরের উপর পা রেখে খুব সাবধানে ডাঙা থেকে দ্বীপে আসা যায়। যুধিষ্ঠিরের গুপ্তচরেরা তার সন্ধানে এখানে এল কি? বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল। প্রশ্নভরা কৌতূহলে উৎকর্ণ দুই কানভরে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করল। গলার স্বর শুনে অশ্বত্থামাকে চিনতে কষ্ট হলো না। স্বস্তির শ্বাস পড়ল। বুকের ভেতর সেই ধক ধক আওয়াজটা থেমে গেল। তবু প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার এখন সজাগ এবং উৎকর্ণ।

অশ্বত্থামা মন্থর পায়ে হেঁটে আসতে আসতে বলছিল। মাতুল হ্রদের এই দ্বীপটি দুর্যোধনের প্রিয় জায়গা। তার সঙ্গে অনেক দিন অনেক রাত এখানে বসে কাটিয়েছি। মন খারাপ করলে

দুর্যোধন চলে আসত এখানে। দ্বৈপায়নের জল, গাছ, পাখির সঙ্গে একটা আত্মীয়তা ছিল তার। আপন মনে তাদের সঙ্গে কথা বলে যেত। তার অর্থ নেই। তবু নিজের মনে বকতে ভালো লাগত। দ্বৈপায়ন দুর্যোধনের বন্ধু। তার একাকীত্বের বিশ্বস্ত সঙ্গী। সুখ দুঃখের আশ্রয়। কাল রাতেও এখানে এসেছিল। নিহত বন্ধু কর্ণের শোকের সান্ত্বনা খুঁজতে দ্বৈপায়নের পাড়ে থম ধরে বসেছিল। প্রিয়তম ভ্রাতা ও বন্ধুর মৃত্যুতেও যে ভেঙে পড়েনি কিংবা কাঁদেনি কর্ণের মৃত্যুতে সেই দুর্যোধনের চোখে জল দেখলাম। কী যে হলো তার কে জানে? আজ তাকে দেখছি না কেন, সেটাই আমার বিস্ময়? বেচারা বোধ হয় ভয় পেয়েছে। আমরা জীবিত আছি সে হয়তো জানে না। তাকে যে কী ভীষণ খুঁজছি আমরা, তাও জানে না সে। দেউল হয়ে যাওয়া জীবনের হাহাকার নিয়ে হয়তো এ বিশাল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।

প্রত্যুত্তরে আচার্য কৃপ বলল : আমার তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তাকে আমার বড় দরকার। তার নির্দেশ না পেলে কাল যুদ্ধ করব কি করে? যুদ্ধের ইতি টানার কোন নির্দেশ নেই। শল্যের মৃত্যুর পরে যুদ্ধের ভার নেবে কে—তাও জানা নেই। এখন দায়িত্ব নিয়ে আমাদের স্থির করতে হবে, রাত পোহালে কী করব?

ভোজবংশীয় কৃতবর্মা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল ঃ যুদ্ধ করার মানুষ তো আমরা তিনজন মাত্র। ভার নেয়ার আছে কি? তিনজনে মিলে যুদ্ধ করতে হবে। দুঃখ শুধু একটাই। চরম দুঃসময়েও আমরা যে তাকে ত্যাগ করে কিংবা ভয়ে পালিয়ে যায়নি, সেটা চোখে দেখল না সে। কী করে তাকে বোঝাই—জয়লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা। কার দিকে ঘুরে দাঁড়াবে কখন কেউ জানে না। দেবতারাও বলতে পারে না। একটানা এগারো দিন যুদ্ধ অনুকূলে থাকার পরে কেউ ভেবেছিল কৌরবেরা হারবে? পাণ্ডবেরা ছল-চাতুরী না করলে আমাদের হার হতো না। এখনও সময় আছে। একটু কপট হলে আমরাও বিজয়লক্ষ্মীকে করতলগত করতে পারি। শঠতার জবাব শঠতা করে দেবার সময় হয়েছে।

অশ্বত্থামা থমথমে গলায় বলল : যে জয় আমাদের হলো না.

সেই জয় পাণ্ডবদেরও হতে দেব না। হেরে যাওয়ার আগে এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেব। এক মহাবিপর্যয়ের স্মৃতি চিহ্ন রেখে যাব আগামী প্রজন্মের কাছে।

গুপ্তকক্ষের সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে শুনল দুর্যোধন। বিদ্যুৎ চমকের মতো তার ভেতরটা চমকাল। একটা অদ্ভুত আনন্দ বুকে ঢেউ দিয়ে গেল। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সে আনন্দ। হঠাৎ-ই মনে হলো জন্ম থেকে অদৃষ্ট তার মন্দ। অদৃষ্ট কোনদিন ভালো করেনি তারা চিরদিন শত্রুতা করেছে তার সঙ্গে। মন্দ ভাগ্য নিয়ে দুর্যোধন দুঃসময়ের সঙ্গীদের পাশে দাঁড়াতে নিরুৎসাহ বোধ করল। তার মন্দ অদৃষ্টের ছায়া পড়ে, পাছে তাদের উদ্যোগে কোন বিঘ্ন হয়, তাই নিজেকে কষ্টে সংযত করল। নাভিমূল থেকে শ্বাস নিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়ল।

নিরাপত্তা বিঘ্ন হওয়ার মতো কিছু করা তার উচিত নয়। বিচারে সামান্য ভুল হলে খেসারত দিতে হয় অনেক। এমন খেসারত জীবনে বহুবার দিয়েছে। আর ভুল না করার জন্যে শক্ত ও সংযত করল নিজেকে। মাত্র এক প্রহরের ভেতর কত বদলে গেছে সে। এক অন্য দুর্যোধন জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে। তথাপি গুহামুখী মনটা অন্ধকারের গুহা ছেড়ে বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছে। গুহার বাইরে এক আলোর পৃথিবী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কিন্তু গুহামুখী মনটা ফিরেও তাকাচ্ছে না। মানুষ তো কেবল জায়মান, সঞ্চারমান-অপূর্ণ কেবলই নিজেকে পরিপূর্ণ করার জন্য বিশাল বিশ্ব তাকে নিরন্তর আহ্বান করছে। আত্ম-নির্মাণের সুর বিবিধ ছন্দে, লয়ে জেগে উঠেছে তার প্রাণের ভেতর। এরকম পরস্পরবিরোধী দুই সত্তার দ্বন্দ্বে আগে কখনো পড়তে হয়নি তাকে। ভাবনা তো আর দেখানো যায় না। পরিবেশের গন্ধ কুড়িয়ে মনটা বোধহয় বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এমন সুরভিত হয়ে যায়। অভিভূত চোখ মেলে দুর্যোধন চেয়ে রইল নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে। তার ভেতরটা চমৎকৃত হচ্ছে, পুলকিত হচ্ছে। কত নতুন অনুভূতি প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে। মনের অভ্যন্তরে কথাগুলো এক অলৌকিক দৈববাণীর মতো তাকে আকুল করল।

মানুষের জীবনটা বড় অদ্ভুত। কত বিস্ময় একজন মানুষের

ভেতরে যে লুকোনো আছে মানুষ নিজেও জানে না। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো দুর্যোধন ক্লান্ত, অবসন্ন গলায় বিড় বিড় করে নিজের মনে আওড়ালো—সখা অশ্বত্থামা, আচার্য কৃপ, বন্ধু কৃতবর্মা আমার পরাজয় নিয়ে কে কি ভাবল তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধ করার সার্থকতা কি? এই জয় কারো কোন উপকারে আসবে না। পাশুপাত অস্ত্র দিয়ে বাজ পাখির মতো ছোঁ-মেরে পাণ্ডবদের জয়ের গৌরবতৃপ্তি এবং সাফল্যের সুখ হয়তো ছিনিয়ে নিতে পার, কিন্তু যারা বেঁচে রইল তাদের সামনে কোন মুখে দাঁড়াব? লোকে বলবে দুর্যোধন খুনী, পাপী—শুধু ওর জন্যে আমাদের এত বড় সর্বনাশ। মানুষেব সামান্য ক্ষমাটুকুও আমি পাব না। কিন্তু পাণ্ডবেরা ভিজে বেড়ালের মতো থেকে তাদের এখন একটা সুন্দর ভাবমূর্তি গড়েছে যে সকলেই ভেবে নিয়েছে যুধিষ্ঠির একটি অত্যাচারিত গোবেচারা মানুষ। আর আমি ভীষণ খারাপ। তাদের এই মনোভাবটা বদলাতে না পারার ব্যর্থতা তো আমারই। তাই যুদ্ধ করার ইচ্ছেটাই মরে গেছে। কর্তৃত্বের মোহ ও মনকে নাড়া দেয় না আর। ঈর্ষা-প্রতিহিংসার আগুনটাই নিভে গেছে। সারা ভারতের নায়ক হওয়ার স্বপ্ন, তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছে। আমার অহংকার দম্ভের পুকুরও শুকিয়ে গেছে। আর কোন সংকল্প নেই। প্রতিশোধ নেয়ার যে ইচ্ছেটা মনেতে ছিল ব্যর্থতা, হতাশার বাতাস লেগে তার তাপ শীতল হয়ে গেছে। আমি এখন নেভা আগুন। সাধ্য নেই নিজে থেকে জ্বলে উঠার। ভেতরের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। বন্ধু অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা তোমাদের সহায়তা পেলে আরো কয়েকদিন যুদ্ধ করতে পারি। পাণ্ডবদের সুনিশ্চিত জয়কে আরো কিছুকাল বিলম্ব করতে পারি মাত্র। কিন্তু আমাদের হারকে জয়ে পরিণত করার জাদু আমার জানা নেই। অশ্বত্থামার যেমন পাশুপাত অস্ত্র আছে, অর্জুনের তেমন বিশ্ববিধ্বংসী ব্রহ্মাস্ত্র আছে। শক্তি ক্ষমতায় এবং ধ্বংসে কোন অস্ত্রই কমতি নয়। দু'য়ের ক্ষমতা সমান। এই হারকে ঠেকানো ভীষণ কঠিন। যুদ্ধ করে যদি হেরে যেতে হয়, তবে সে যুদ্ধ করে লাভ কি? পরাভবের অপমান, লজ্জা, গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকার

মতো বিড়ম্বনা আর নেই।

হঠাৎ দুর্যোধনের চিন্তায় ছেদ পড়ল। বাইরে কারা যেন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। ছুটন্ত ঘোড়ার কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ পাহাড় অরণ্যে ঝড় বয়ে গেল। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা গেল। তারপরেই কে যেন কাকে ডাকল। অচেনা গলা। থমথমানো স্তব্ধতার মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতা নিয়ে দুর্যোধন পাথরেব ওপর চুপ করে বসে রইল। একটা উদ্গত নিশ্বাস বুকের পাঁজরে আটকে যায়, ব্যথা করে।

অশ্বখুরের শব্দ বিপদ সংকেতের মতো বাজতে লাগল তার বুকের ভেতর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার অনুসন্ধিৎসা প্রবল এবং উদ্বেগও প্রচ্ছন্ন ছিল। দ্বিধার ভাবটা কেটে গেল এক সময়। তারপরে জিজ্ঞাসা জাগল। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মার স্তম্ভিত ক্ষুব্ধ মুখ সে দেখতে পেল না। তারাও দেখতে পেল না দুর্যোধন কি ভীষণ যুদ্ধ করছে নিজের সঙ্গে। তার লড়াইটা ছিল হার-জিতের। জীবনভোর সে শুধু জয় চেয়েছে। ভাগ্যের কাছে কখনো কোন অবস্থায় হেরে যায়নি। আজও হারবে না। দুর্যোধন হারতে জানে না। হেরে গেলে দুর্যোধন কী নিয়ে বাঁচবে? জয় তার স্বপ্ন, ধ্যান, জ্ঞান। সার্বিক জয়ই শুধু জয় নয়, আংশিক জয়ও জয়। রাত পোহালে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করা মানে যেচে হারকে বরণ করা। তার চেয়ে অনেক ভালো এই হার এড়িয়ে গিয়ে আর একটা বড় যুদ্ধের সম্ভাবনা জীইয়ে রাখা। যে কোন উপায়ে হারটুকু এড়িয়ে গেলে আমি যুদ্ধে পরাজিত এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। এটাই বা কম কিসে? হেরে যাওয়া, আর হার এড়িয়ে আত্মগোপন করা কখনো এক নয়। আত্মগোপন হলো যুদ্ধকে জীইয়ে রাখার এক অভিনব কৌশল। এতে যুদ্ধ শেষ হয় না। যুদ্ধের জয় অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ বিজিত তো বিজেতার কাছে নতি স্বীকার করেনি। তার অধীনতাও মেনে নেয়নি। প্রতিপক্ষ অংশগ্রহণ না করায় যুদ্ধটা স্থগিত রইল। তার পতন না হওয়া পর্যন্ত যুধিষ্ঠির জয়ী একথা বলবে না কেউ। আত্মগোপন করে যুধিষ্ঠিরের বিজয়কে কিছু বিলম্বিত করল। তাকে একটা উদ্বেগের মধ্যে রাখা হলো। পরন্তু এখনি হারটা হার হলো না। আগামী

দিন এই আত্মগোপন যে তার জয়ের বড় একটা সংবাদ হয়ে উঠবে না, কে বলতে পারে? দুর্যোধনের বারংবার মনে হতে লাগল— এটাও কম কিছু নয়। এও এক ধরণের যুদ্ধ কৌশল। কূটনীতি। একে তুচ্ছ করে দেখার কিছু নেই। একটা বড় কিছুর প্রত্যাশায় পাণ্ডবেরাও অজ্ঞাত বাস করেছিল।

বুকের গভীর থেকে একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে সজোরে ত্যাগ করল। নিজেকে যেভাবেই সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করুক না কেন দুর্যোধন, ভিতরে ভিতরে এক ভীষণ যন্ত্রনা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। প্রতিকারহীন যন্ত্রনা দুর্বল করে দিচ্ছিল তাকে। তাই নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মনে মনে আউরালো-জয়লাভই আমার উদ্দেশ্য। আপাতত যুদ্ধটা স্থগিত থাকা ভালো। সকলেই মঙ্গল। একটু সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে, মানুষ শোক-তাপ ভুলে গেলে আবার নতুন করে কিছু চিন্তা তো করা যাবে।

সুড়ঙ্গের উঁচু উঁচু ধাপ ভেঙে দেয়াল ধরে ধরে দুর্যোধন বেশ কিছুটা নিচে নেমে এল। উপর থেকে টিপ টিপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে। নিচের পিচ্ছিল পাথুরে পথে যাওয়া বিপজ্জনক। তা ছাড়া অন্ধকারে বেশি গভীরে নেমে হবেই বা কি? মসৃণ এবং প্রশস্ত সিঁড়ির চাতালে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। ক্লান্ত চোখে দুর্যোধনের ঘুম নামল। কিন্তু জায়গাটা মোটে নিরাপদ নয়। তাই জোর করে চোখের পাতা টেনে টেনে জেগে থাকার চেষ্টা করল।

তন্দ্রার মধ্যে অশ্বক্ষুরের শব্দ শুনল দুর্যোধন। ঘোড়ায় চেপে কারা যেন সুড়ঙ্গের খুব কাছে এসে থামল। অবশ স্নায়ুগুলো কাজ করছিল না। ঝিমধরা একটা অবস্থার ভেতর সে স্পষ্ট উপলব্ধি করল আগন্তুকেরা তার শত্রু নয়, দুঃসময়ের সাথী।

ঘোরের মধ্যে আচার্য কৃপের উদ্বিগ্ন গলার স্বর শুনল। দুর্যোধনকে কোথাও পাওয়া গেল না। এ আঁধারে তাকে খুঁজব কোথায়? অথচ সে একজন লড়াকু মানুষ। কোনদিন কোন অবস্থায় নিজের সঙ্গে অপোষ করেনি। চিরদিন নিজের প্রতিকূল ভাগ্য আর পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করেছে। মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে

বেড়াবে এ আমি কিছুতে বিশ্বাস না। পালিয়ে আত্মরক্ষা করার মানুষ নয়। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও মৃত্যুপথযাত্রী পিতামহের অনুরোধে পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্মানজনক সন্ধি করতেও সে রাজি হয়নি। কোন প্রাণে তাকে ভীরু কাপুরুষ বলব।

কৃতবর্মাও সগর্বে বলল: তার মতো দৃঢ়চেতা সংগ্রামী মানুষকে ভালোবেসেই আমি স্বজন ত্যাগ করেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার অন্তর্ধানের কারণ আমার বোধগম্য হলো না। সে তো ভালো করেই জানে এই রাতটুকুই আমাদের শলা-পরামর্শের সময়। রাত পোহালেই যুদ্ধে যেতে হবে। কালকের যুদ্ধ একটু অন্যরকম। শুধু আমরা চারজনে লড়াই করব। লড়াইটা কি ভাবে করলে জয়ের পথ সুগম হয় তার তো একটা বোঝাপড়া থাকা চাই। কিন্তু সেই আসল মানুষটিই বেপাত্তা। এভাবে দুর্যোধন বিশ্বাস-ঘাতকতা করল কেন? শুনতে কটু হলেও কথাটা একটুও মিথ্যে নয়।

কৃপাচার্য মৃদুস্বরে আপত্তি করল: না, না, দুর্যোধনকে বিশ্বাসঘাতক বললে তার উপর অবিচার করা হয়। তবে, নিশ্চিত করে কারো সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। অবস্থা ভেদে মানুষকে অনেক কিছু করতে হয়। কে কোন অবস্থায় কি রকম আচরণ করবে সেটা মনের ব্যাপার। প্রত্যেক মানুষের মনের গড়ন আলাদা বলেই মানুষে মানুষে পার্থক্য। কখন কোন ঘটনার মুখোমুখি হয় একজন চিরচেনা মানুষও হাঠাৎ সব হিসেব ভুল করে দিয়ে বদলে যায় তা নিজেও জানে না। তাতে কতরকম সমস্যা হয়, কত যে ক্ষতি হয় তার হিসেব করে দেখে না কেউ। পিতামহ ভীষ্মের কথা ভাব। তাঁর মতো চমৎকার ভারসাম্য সম্পন্ন দৃঢ়চেতা মানুষেরও শিখণ্ডী সম্পর্কে কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা ছিল। বুদ্ধি দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের রথে যখন সে পিতামহকে আক্রমণের উদ্যত তখনই তাঁর ভাবরাজ্যে আকস্মাৎ কি ঘটে গেল তিনিই জানেন। সেনাধ্যক্ষ্যের দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে, হস্তিনাপুরকে রক্ষার কথা বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তিগত দুর্বল ভাবাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র ত্যাগ করলেন। অর্জুন এবং শিখণ্ডী যুক্তভাবে তাঁর উপর শরবৃষ্টি করতে

লাগল। প্রতিরোধের কোন চেষ্টা করলেন না। অপরাজেয় সেই মানুষ একবারও পরাভবের জন্যে কাতর হলেন না, কিংবা দুরন্ত ক্রোধে, অপমানে জ্বলে উঠলেন না। দাঁতে দাঁত দিয়ে সব আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করলেন। অর্জুন-শিখণ্ডীকে সেজন্যে কোন তিরস্কার করলেন না। এভাবে তাঁর মতো একজন শ্রেষ্ঠ মহারথীর মৃত্যু বরণের কোন মানে হয়? ভীষ্মের কাছে নিশ্চয়ই তার একটা অর্থ ছিল। তাঁর সেই ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে বড় ছিল না কৌরবদের স্বার্থ। ভীষ্মের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার মূল্য দিতে হলো আমাদের সকলকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এই বিপর্যয়ের জন্যে অংশত তিনিও দায়ী। ভীষ্ম বেঁচে থাকলে কৌরবদের এইভাবে হার স্বীকার করতে হতো না। যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে শোকে দুঃখে, ব্যর্থতায়, হতাশায়, কিংবা তীব্র অসহায়তাবোধে যদি দুর্যোধন কর্তব্যের ভুল করে তবে একজন মানুষ হিসেবেই সে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। বিশ্বসঘাতক বলে তাকে অভিযুক্ত করার কোন কারণ নেই। কৃতবর্মা, আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না অন্ধকারে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে অনুভব করতে পারছি। আমার কথাশুনে তুমি খুব অবাক হয়েছ। আমরা সকলে দুর্যোধনের উপর অনেক অবিচার করেছি। তার অভিমানী মনটাকে কখনো খুঁজে দেখিনি। আজ কেন জানি না, অভিযোগের জায়গায় সহানুভূতি উপচে উঠছে। তার প্রতি এ আমার করুণা নয়, গভীর শ্রদ্ধার অঞ্জলি। আগে এই শ্রদ্ধাবোধটা অন্তরে কখনো জাগেনি। বাইরের অন্ধকার আমার মনের অন্ধকারের ঘরে হাজার হাজার দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই বিবাদের ইতিহাসটা আমি দেখতে পাচ্ছি। কৃতবর্মা, বুকে হাত দিয়ে বল আমরা কেউ দুর্যোধনের জন্যে যুদ্ধ করছি না, নিজের জন্যে করছি। এই যে আমি, তুমি, অশ্বত্থামা এখনও যুদ্ধের কথা চিন্তা করছি, জয়ের স্বপ্ন দেখছি সে কি দুর্যোধনের জন্যে? না, এই জয়ের ভেতর, হারানোর ভেতর আমাদের নিজ নিজ স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত সুখ লুকোনো আছে। অনেক জমা করা ক্রোধ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণার প্রতিশোধ নেয়া হয়নি বলে তো যুদ্ধের সাধ এখনো মেটেনি। বুকে প্রতিহিংসার যে আগুন জ্বলছে তা না নেভা পর্যন্ত আমাদের মুক্তি নেই। এই সত্যটা অকপটে স্বীকার

করতে আজ আমার লজ্জা নেই।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল কৃতবর্মা। নিস্তব্ধ অন্ধকারে তার গভীর শ্বাসপতনের শব্দের সঙ্গে বেরিয়ে এল—হুম্। আচার্য নিজেদের ভুলটা সেই কবুল করলে, কিন্তু বড় দেরী করে স্বীকার করলে। অথচ দুর্যোধন তাদের অভিপ্রায় মতলব কত আগে টের পেয়েছিল। কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। পাণ্ডবদের অভিনয়ে ভুলে গেল। সে ভুল ভেঙেও গেল একদিন। কিন্তু তার জন্যে দুর্যোধনকে অনেক মূল্য দিতে হলো। আর তোমরা বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় সবিস্ময়ে নিজেকে প্রশ্ন করলে এও কি সম্ভব? পাণ্ডবেরা মিথ্যেবাদী, অধার্মিক, নীতিহীন হলো কি করে? বারানাবতের অগ্নিকাণ্ডে যারা মৃত বলে ধোঁকা দিল তারা এমন করে বোকা বানিয়ে ঠকাল কেন? কতকগুলো নিরীহ, গরীব মানুষের দারিদ্র আর ক্ষুধা নিয়ে প্রতারণা করল কেন? খাদ্য পানীয়ের লোভ দেখিয়ে সরল জংলী মানুষগুলোকে গৃহে ডেকে আনল। তাদের পেট পুরিয়ে খাওয়াল, আশ্রয় দিল। তারপর ঘুমোলে গৃহবন্দী করে ঘরে আগুন দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল। কী নিষ্ঠুর! কী ভয়ানক! আশ্চর্য তাদের অনুশোচনা নেই, বিবেকের যন্ত্রণা নেই। রাজ্য এক সিংহাসনের জন্যে তারা কত নির্মম, নিষ্ঠুর, বিবেকহীন, নীতিহীন হতে পারে তার নির্দয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এক ভয়সৃষ্টি করল। সেই প্রথম টনক নড়ল। আট ঘাট বেঁধে তারা হস্তিনাপুরের দাবি নিয়ে যেদিন রাজধানী প্রবেশ করল ভীষ্ম অসহায়ের মতো পিতাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কুরুরাজ্য ভেঙে দু'টুকরো করল। তবু তোমরা বললে না, যুধিষ্ঠির অন্যায় করেছে। কী মোহে তোমরা ভুলে ছিলে তোমরাই জান। যুধিষ্ঠিরের কার্যের কড়া সমালোচক কেবল দুর্যোধন। কিন্তু তার কথা কেউ শুনল না। প্রবল সাম্রাজ্য তৃষ্ণা চরিতার্থ করতে যুধিষ্ঠির কপটতা করে ভারত সম্রাট জরাসন্ধকে অন্যায় যুদ্ধে গুপ্ত ঘাতকের মতো হত্যা করল। ধর্মের ভেক ধরে যুধিষ্ঠির আর্যাবর্তে তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে রাজসূয় যজ্ঞ করল। তার শঠতা প্রতারণার প্রতিবাদ করার অপরাধে শিশুপালকে প্রাণ দিতে হলো। হত্যার রাজনীতি করে যে যুধিষ্ঠির ক্ষমতায় ফিরতে

চাইল এটা আর গোপন রইল না। তবু এক আশ্চর্য মায়ায়, অন্ধ মোহে তোমরা যুধিষ্ঠিরকে সমর্থন করতে লাগলে। কিন্তু তার আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে ভারতের রাজন্যবর্গ এককাট্টা হয়ে যখন দুর্যোধনের রাজছত্রতলে সমবেত হাওয়ার গুরুত্ব অনুভব করল তখন তোমরা কুরুবৃদ্ধেরা সচেতন হলে। দুর্যোধনকে নেতা মানলে। ভারত রাজনীতিতে যুধিষ্ঠির সেই প্রথম কোণঠাসা হয়ে পড়ল। যুধিষ্ঠিরও টের পেল তার পায়ের তলায় মাটি আলগা হয়ে গেছে। যুধিষ্ঠির ভাঙবে তবু মচকাবে না। নিজের দুর্বলতা ঢাকতে পণ রেখে পাশা খেলার এক আশ্চর্য নাটক করল। দুর্যোধন তার চালাকী ধরতে না পেরে নিজের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করল। নিজেদের স্বার্থ নিরাপদ করতে এবং ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের কাছ থেকে কুরুবংশ ধ্বংসের একটা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি লাভ করতে এবং প্রস্তুত হতেই বনে গেছিল। তোমরা তাদের মতিগতি না বুঝে দুর্যোধনের সমালোচনায় ব্যস্ত থাকলে। কার্যত তোমাদের ঔদাসীন্য এবং দুর্যোধন বিরোধিতার পুরো সুযোগ নিয়েছে পাণ্ডবেরা।

কৃতবর্মার অভিযোগের কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারল না কৃপাচার্য। মাথা হেঁট করে স্বীকারোক্তি করল। তোমার অভিযোগ অস্বীকার করব এমন জোর নেই মনে। তাই তো নিজেদের জীবন দিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছি। যতদিন বাঁচব যুদ্ধ করব।

আচার্য দুর্যোধনের পতনে কিংবা মৃত্যুতে এযুদ্ধ তা-হলে শেষ হবে না। আমাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে এযুদ্ধ করব। এযুদ্ধ তো দুর্যোধনের জন্যে নয়—নিজের জন্যে আমরা করছি। পাণ্ডব নামধারী বংশ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এযুদ্ধ আমরা করব।

বন্ধু কৃতবর্মা, যুদ্ধ তো এখন আর কৌরব পাণ্ডবের ভেতর হচ্ছে না, হচ্ছে পাঞ্চাল যাদব এবং তাদের অনুগত রাষ্ট্রজোটের সঙ্গে হস্তিনাপুর রাষ্ট্রজোটের অনুগামী এবং সমর্থকদের। রাজা নেই, আছে তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যোদ্ধা। তাও সংখ্যায় তিনজন মাত্র। বুঝতে পারছি না, এযুদ্ধ করে হবে কি?

দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে দুর্যোধন ঘুমোল। ঘুমটা গাঢ় নয়। ঘুমের ভেতর মনের বিবিধ নানা প্রতিক্রিয়া এলোমেলো ছবি হয়ে ফুটে উঠছিল। অর্ধচেতনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছিল, ভীম মারার জন্যে তেড়ে আসছে তাদের দিকে। আর তার ভাইরা ভয়ে পালাচ্ছে। মুখে তাদের বিপন্নভাব, চোখে এক অসহায় দৃষ্টি। ভাইরা দৌড়চ্ছে আর সে ভীমকে প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু ধরে রাখতে পারছে না। ভীম তার গলা চেপে ধরে মুক্ত করল নিজেকে। তারপর দুঃশাসনকে চেপে ধরল। নিরুপায় হয়ে বিদুরের কাছে ছুটল নালিশ করতে।

স্বপ্নে সে আর তখন বড় নেই। কিশোর হয়ে গেছে। ঘুমের ভেতর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল তার গলার স্বর। বলল: ক্ষত্তা ভীমের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এবার একটু সামলাও। তোমরা ওকে কিছু বল না। তোমাদের আস্কারা পেয়ে পেয়ে ও এরকম মারকুটে হয়েছে। ছোট-মাকে নালিশ করে ফল হয় না। তুমিও গায়ে মাখ না। তা-হলে আমরা যাই কোথায়? তোমরা সবাই মিলে আমাদের কি তিষ্ঠতে দেবে না?

বিদুর ভুরু কুঁচকে নিস্পৃহভাবে বলল: এক হাতে তালি বাজে না। ওকে কিছু না করলে ও কারো গায়ে হাত দেয় না। তোমরা সকলে মিলে ওর পেছনে লাগ বলেই ও খেপে যায়।

দুর্যোধন অবাক গলায় বলল: তোমরা ভীমের কোন দোষ দেখতে পাও না। আমাদের অপরাধী করলে তোমাদের খুব সুখ হয়। কেন, আমরা তোমাদের কাছে কি করেছি? আমাদের দোষটা কোথায়?

বিদুরের চোখে মুখে ধূর্ত হাসি। বলল: এ প্রশ্ন তুমি নিজেকে কর। ভাইয়ে ভাইয়ে অমন মারামারি একটু হয়ে থাকে। নালিশ করার মতো কিছু নয়। সামান্য ব্যাপারকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তোলা তোমার স্বভাব।

দুর্যোধন সবিস্ময়ে বলল: ক্ষত্তা! তুমি এসব কথা বলছ! আসলে তুমি আমাকে সহ্য করতে পার না। তোমার কাছে আমার আসাই ভুল হয়েছে।

বিদুর ধমক দিয়ে বলল: চুপ কর। যত বড় মুখ নয় তত বড়

কথা। ভীমকে ঈর্ষা কর বলেই তার নামে দোষারোপ করছ। তুমি, দুঃশাসন ছাড়া ভীমের নামে তো আর কেউ অভিযোগ করে না।

চমৎকার। আমি সকলের বড়। তাদের হয়ে নালিশ করতে এসেছি। কিন্তু তুমি আমাদের কোন কথা শুনতে চাও না। আমাদের যে কিছু অভিযোগ থাকতে পারে, বক্তব্য থাকতে পারে, সে কথাটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দাও। তুমি এবং ছোট মা চাও, ভীম পেশী দেখিয়ে আমাদের দাবিয়ে রাখুক। তার ভয়ে জুজু হয়ে থাকি আমরা। ভীমকে দিয়ে তোমরা যে আমাদের বাড়ী ছাড়া করতে চাইছ, এটা এখন আর গোপন নেই।

ক্রোধে বিদুরের মুখ রাঙা হলো। ভর্ৎসনা এবং তিরস্কার করে বলল ঃ দুর্যোধন! গুরুজনদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় শেখনি। তোমার মতো একটা বাজে ছেলের সঙ্গে আমার কথা বলাই অন্যায় হয়েছে।

দুর্যোধন তার সব রাগ ভেতরে শুষে নিয়ে নিরুত্তাপ গলায় বলল ঃ ক্ষত্তা, তুমি আর ছোট মা আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে মধুর সম্পর্কটা তিত করে তুলেছ। তোমাদের জন্যে রেষারেষি বাড়ছে। অথচ, তারা যখন প্রথম হস্তিনাপুরে এল তখন তো কটা বছর আমরা বেশ ছিলাম। স্বার্থহীন ভালোবাসায়, গভীর মেলামেশায় এত নিবিড় আর মধুর ছিল আমাদের সম্পর্ক যে তোমরা সহ্য করতে পারলে না। আমরা এবং যুধিষ্ঠিররা আলাদা এটা বোঝানোর জন্যে ভীমকে অস্ত্র করেছ। ভীম চিরদিনই একটু বোঝে কম, সহজ সরল মানুষ। তাই ওকে দিয়ে যা খুশি করানো যায়।

বিদুরের অধর বক্র হলো। ব্যঙ্গ করে বলল ঃ এত যদি বুঝে থাক তা হলে তার নামে নালিশ করতে এলে কেন?

দুর্যোধন হাসি হাসি মুখ করে বলল ঃ সে প্রশ্ন আমারও। সেই ভালো মানুষটা খারাপ হয়ে গেল কেন? হঠাৎ সে এত নিষ্ঠুর, বর্ব্বর হলো কেন? ভীমের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে এসে তোমাকে আর ছোট-মাকে দেখি। তোমাদের কথাবার্তা-আচরণই বলতো তোমরা চাইলেই ভীমের দৌরাত্ম্য বন্ধ হতো। আমাদের সৌহার্দ্দ, বন্ধুত্ব অটুট থাকত। কিন্তু তোমরা চাওনা বলেই

আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। ধার্তরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবেরা আলাদা হয়ে গেল। যুধিষ্ঠিররা কেউ নিজেদের কৌরব বলে না। নিজেদের তারা পাণ্ডব বলে পরিচয় দেয়। কেন?

বিদুরের অধরে কৌতুক হাসি। বলল : তোমরা তাদের কৌরব বলে মেনে নাওনি। কৌন্তেয়রা বহিরাগত, এবংশের কেউ নয়। পরগাছা বলে তাদের হেনস্তা করছ। তোমাদের সেই অবহেলা, অনাদরের ছায়া থেকে পাণ্ডবেরা যদি একটু দূরে দূরে নিজেদের মতো থাকতে চায়, তাতে অপরাধটা কি? প্রত্যেক মানুষের নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার তো আছে। কেবল ভীম মেপে মেপে চলতে পারে না। তাই একটুতে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। আবেগ প্রবণ ভীমের রাগটাই শুধু দেখলে, তার মনটাকে বুঝলে না।

দুর্যোধন কথা খুঁজে না পেয়ে মাথা হেঁট করে রইল। বিদুর তাকে নীরব দেখে বলল ঃ তুমি মিছেমিছি ছোট-মা এবং আমাকে দোষারোপ করলে। ভালো করে সব না বুঝে। দোষারোপ করাটা তোমার বদ অভ্যাস। যে মানুষ উত্তম সে বোঝে কোনটা ভালো, আর যে মানুষ অধম হয় সে অন্যকে বেইজ্জত করার কথা ভাবে। উত্তম অন্যকে শ্রদ্ধা করে, ভুলের জন্য অনুশোচনা করে আর অধম সে ভালোবাসে ঈর্ষাকে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে তৎপর হয়।

দুর্যোধন রাগে দপ্ করে জ্বলে উঠল। বলল ঃ ক্ষত্তা, আমার উপর তোমার রাগের হেতু বুঝি না। ভীম আমাদের উপর দুর্ব্যবহার করে জেনেও তুমি তার হয়ে সাফাই গাইছ। তোমার এই পক্ষপাতিত্বের জন্যে আমরা যদি তোমার উপর শ্রদ্ধা হারাই, তাহলে দোষ দিও না।

অপমানে বিদুরের মুখ রাঙা হয়ে গেলো। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ঃ তুমি অত্যন্ত উদ্ধত, দুর্বিনীত। তোমার সঙ্গে কথা বলাটা আমার অন্যায় হয়েছে।

দুর্যোধন মরিয়া হয়ে বলল ঃ তাচ্ছিল্য করে চলে যেতে দেব না তোমায়। প্রতিকার প্রার্থনা করতে এসে তোমার দুর্ব্যবহার শুধু পেলাম। আচ্ছা ক্ষত্তা, তুমি বল, মানুষ হিসেবে আমি কি খুব খারাপ? একটা মানুষ জন্ম থেকে তোমাদের চক্ষুশূল কেন?

ঐ নিষ্পাপ শিশুটির দোষ কি ? তার উপর তোমাদের আক্রোশের হেতু কি ? বড় হয়ে সেই শিশুটি তোমার বিরূপ মনটাকে অনুরাগে ভরে দেবার জন্যে কত কি করতে চায়। কিন্তু তুমি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলে। অথচ, তোমার একটু করুণা পেলে তার হৃদয়টা ভরে উঠত। জীবনটা ধন্য হতো। কিন্তু তুমি সে সুযোগ দাওনি কখনো। আমি কি করেছি তোমার ? তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে মুখে মুখে তর্ক করেছি, প্রতিবাদ করেছি, রাগ করেছি, অভিমানে ক্ষেপে উঠেছি। কিন্তু আমার মনের অয়ন পথটা বুঝলে রাগ করে থাকতে না। বলতে না আমি উদ্ধত, দুর্বিনীত। ক্ষত্ত্রা তারুণ্যের ধর্ম হলো বিচার বিশ্লেষণ করে একটা সত্যে পেঁ ানো, সেই সত্যটা নির্ভয়ে বলা যদি আমার দোষ হয়ে থাকে তা-হলে আমি দুর্বিনীত। আমার বিচারে যদি কোন ভুল থাকে আমি স্বীকার করব। কিন্তু তুমি আমার দোষ, ত্রুটি সংশোধনের কোন সৎ-উপদেশ দাওনি। কিংবা ভালো হয়ে চলার পরামর্শ দাওনি। শুধু অভিযোগ আর তিরস্কার করেছ। কিন্তু পাণ্ডবদের বেলায় তুমি একেবারে আলাদা। আমাদের কারো ভেতর সত্যি ভালো কিছু নেই কি ? বিকর্ণ বহু সৎগুণের অধিকারী হয়েও তোমার সমাদর বঞ্চিত কেন ? কৌরবরা তোমার চক্ষুশূল। স্বার্থ ছাড়া কোন মানুষের সম্পর্ক তৈরী হয় না। তোমার সঙ্গে পাণ্ডবদের যে একটা চোরা গোপ্তা সম্পর্ক আছে এই বিষসন্দেহ আমাদের মনে বড় হয়ে উঠছে। তুমিও চাও এই সন্দেহটা দিন দিন আরো বেশী হোক। আমার দুর্বিনীত জিজ্ঞাসার পেছনে যে একটা অভিমান আছে, সুতীব্র ঈর্ষার জ্বালা আছে সেটা তুমি ভালো করেই জান। বোঝার মতো তোমার মনও আছে। কিন্তু সে মনটা শুধু পাণ্ডবদের কথাই ভাবে। যুধিষ্ঠির তোমার কে ? তার কথা এত ভাব কেন ? তোমার ভাবনার ছিটেফোঁটা আমরা পাই না কেন ? এই প্রশ্ন করাও কি আমার ঔদ্ধত্য ?

মানুষ তার কাজের জন্যে অন্যের কাছে ধরা পড়ে গেলে ভিতরকার লজ্জায়, অপমানে, তার ভেতরটা তপ্ত হয়ে উঠে। চোখ, মুখ, কান গরম হয়ে যায়। রি রি করে জ্বালা করে। ঘুমের

ভেতর দুর্যোধন স্পষ্ট দেখতে পেল বিদুরের মুখে চোখে সেরকম একটা গণগণে ভাব। মুখখানি তার তাম্রাভ প্রাপ্ত হয়েছে।

বিদুরের বিপন্ন মুখে অপ্রস্তুত হাসি। বলল: পাগলের প্রলাপের জবাব হয় কি? তুমি এখন যেতে পার।

বিদুরের মূর্তি মিলিয়ে যাওয়ার পরেই শকুনির মুখ ভেসে উঠল। হাসি হাসি মুখ করে দুর্যোধনের দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে চেয়ে বলল: ভাগ্নে, বয়স যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু মানুষ চিনতে শেখার বিদ্যেটা আয়ত্ত হয়নি। বিদুরকে এখনও যদি চিনে না থাক তা-হলে পস্তাতে হবে। বিদুর মানুষটা ভালো নয়। সে তোমাদের ভালো চায় না। হিতৈষী সেজে তোমাদের ধ্বংসের চক্রান্ত করছে।

বিষণ্ন গলায় দুযোধন সহসা প্রশ্ন করল: আমার উপর ক্ষত্তার এত রাগ কেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকে তিনি আমার সঙ্গে শত্রুতা করছেন। কি করেছি আমি তাঁর।

শকুনি তার প্রশ্ন শুনে হাসল। ঘরের ভিতর অন্ধকার। তবু স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছিল। তার কথাও শুনতে পাচ্ছিল। শকুনি বলল: দুর্যোধন রাগের শিকড় খুব গভীরে। তোমার পিতা, পাণ্ডু এবং বিদুরের পিতা একই ব্যক্তি। বিদুর দাসীপুত্র হওয়ায় এই বংশের সন্তান বলে গণ্য হলো না। কিন্তু এই পরিবারে একজন হয়ে রইল। শিক্ষা-দীক্ষায়, বুদ্ধিতে, পারদর্শিতায় এবং যোগ্যতায় সে তাদের চেয়ে কম নয়। তবু বংশ পরিচয় এবং উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত। সেজন্য একটা ক্ষোভ ও বেদনা ছিল তার। কিন্তু খুব চতুর এবং কূট কৌশলী বলে বাইরে থেকে তার মনের কথাটা টের পেত না কেউ। প্রত্যাশা পূরণের ফন্দীটা তাই একটু অন্যভাবে করল। এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়ে তোলার নাম বংশগতি। একজন মানুষ এক জীবনের মধ্যে তার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ করতে পারল না বলে সে ব্যর্থ হয়ে গেল না। আকাঙ্ক্ষার অম্লান শিখাটা তার মাধ্যমে তৈরী অন্য এক প্রাণের ভেতর দিয়ে যদি পূর্ণ করতে পারে, সেও এক ধরণের সাফল্য। আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা। বিদুরের সেই মুহূর্তে মনে হলো, পাণ্ডু তো স্বাস্থ্যের কারণে সিংহাসনচ্যুত হয়েছে। পুত্র উৎপাদনের অক্ষমতাজনিত কারণে তার কোন

ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীও থাকবে না। অথচ সে একটু ইচ্ছে করলেই পাণ্ডুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্বের ধারাটা তার ও কুন্তীর গোপন প্রণয়ের মাধ্যমে অনায়াসে দূর করতে পারে। কুন্তীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করল বিদুরের প্রথম সন্তান যুধিষ্ঠির।

দুর্যোধন চমকানো বিস্ময়ে ঘুমের ভেতর নিরুচ্চারে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল : মাতুল, তুমি বল কি? সেই বললে, কিন্তু বড় দেরী করে বললে। পিতা, পিতামহ কী এসব জানতেন?

জানবেন কেমন করে? কুন্তীর মাধ্যমে যে সন্তান সৃষ্টি হলো—কে তাদের সৃষ্টি করল, কী করে সে গর্ভবতী হলো—এই রহস্য যাতে জানাজানি না হয় সেজন্যে স্বাস্থ্যের কারণে পাণ্ডু এবং তার মহিষীদ্বয়কে অন্যত্র পাঠানোর যখন বন্দোবস্ত হচ্ছিল, বিদুরই হিমালয়ের শতশৃঙ্গ পর্বতে তাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে দিল। লোকচক্ষু আড়ালে বিদুর কৌরব বংশ ধ্বংসের বীজ বপন করল। দাসীপুত্র বলে যারা তাকে অবজ্ঞা করল, অবহেলা করল তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা নীতি গ্রহণ করল। আমার দৃঢ় ধারণা কৌন্তেয়রা বিদুরের ক্ষেত্রজ পুত্র। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। শুধু এই কারণেই পাণ্ডব নামধারী কুন্তী পুত্রদের প্রতি তার অসীম স্নেহ, অসীম মমতা। তার শরীর থেকে তারা জন্মগ্রহণ করেছে বলেই বিদুর পিতার মতো তাদের আগলে বেড়ায়। তাদের অভিভাবকত্ব কেউ দেয়নি তাকে, সে নিজেই অভিভাবক হয়ে বসল। দিনের বেশিভাগ সময় তাদের কথা ভেবে কাটে। পাণ্ডবদের জন্যে বিদুরের টানটা একেবারে প্রাণের। তোমাদের জন্ম থেকে দেখছে। তোমাদের সঙ্গে একসাথে সর্বক্ষণ আছে। তবু তোমাদের প্রতি তার ছিটে ফোঁটা টান, দরদ মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা নেই। অথচ, তোমরা পাণ্ডবদের মতো তাকে শ্রদ্ধা কর, মান্য কর, তবু তোমরা তার চক্ষুশূল। পাণ্ডবদের সঙ্গে রক্তের টান আছে বলেই পাণ্ডবদের দেখলেই তার মন ভরে যায়। পিপাসার্তের মতো মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে তাদের মুখের দিকে। একমাত্র নিজের সন্তান ছাড়া এধরণের কোমল অনুভূতিতে শরীর মন স্পন্দিত হয় না। ভাগ্নে, এখন বুঝছ জন্মক্ষণে তোমাকে বিসর্জন দেবার জন্যে বিদুর কেন উঠে পড়ে লেগেছিল। পাছে তুমি তার পুত্র

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর পথে বাধা হও, তাই তোমাকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে একদল মতলববাজ লোভী ব্রাহ্মণও তার সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল। এই মানুষটা কোনদিন তোমাদের ভালো চায়নি। চিরদিন তোমাদের শত্রুতা করেছে। ধর্মের ভণ্ডামি করেছে। বাইরে দেখে তার ছদ্মবেশ চিনবে কে?

সহসা বিদুর যেন অট্টহাসি করে উঠল। হায়নার মতো ভয়ঙ্কর সে হাসি রাতের নিস্তব্ধতাকে ফালি ফালি করে দিল। ঘুমের ভেতর সে চমকে উঠল। চোখ মেলে দেখল সুড়ঙ্গের চাতালে শুয়ে আছে। তার আশ-পাশে কেউ নেই। এতক্ষণ তাহলে সে স্বপ্ন দেখছিল। মাতুল শকুনি যা বলল সে তো তার কথা নয়। সে তো নিহত। তাহলে এ হয়তো তারই গভীর অভ্যন্তরের কথা। অবদমিত মনের প্রশ্নগুলো হয়তো স্বপ্নে শকুনির রূপ ধরে পাণ্ডবদের রহস্যময় জন্মবৃত্তান্তের অনুদ্ঘাটিত অধ্যায় উদ্ঘাটিত করল।

দুর্যোধন বেশ কিছুক্ষণ থম ধরে বসে রইল। চোখের কোটরে কালি, মুখে দুশ্চিন্তা, দৃষ্টিতে কেমন একটা দিশেহারা ভাব। তার সমস্ত সত্তার একমুখী স্রোত দুরন্ত এত গতিতে নিয়ে চলেছে তাকে বর্তমান থেকে অতীতে। বারে বারে তার চিন্তা কখনো দিনে, কখনো রাতে—ফিরে ফিরে চলে যাচ্ছে হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর পর্যন্ত।

দুর্যোধন ঘুমোচ্ছিল। ঘুমটা খুব গাঢ় নয়। কেমন একটা ঘোরের ভেতর দু'চোখ বোজা। তবু নিমীলিত দুই চোখে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। একটা থমধরা বিষণ্ণতা নিয়ে নিবিড় অন্ধকারে সুড়ঙ্গের সিঁড়ির চাতালে বসে সে একা নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছে। হঠাৎ পাণ্ডবদের সঙ্গে তাদের শত্রুতার মূল শিকড়টি সে দেখতে পেল। সুদূর অতীতের ঘটনারাশি তার ঘুম ঘুম চোখে ছায়ার মতো, স্বপ্নের মতো ভেসে উঠল।

পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে যখন ছিল না, কৌরবদের কোন অশান্তিও ছিল না। বলতে কি, পাণ্ডবেরা এসে তাদের সুখ-শান্তি, ঘুম কেড়ে নিল। আঙ্গুল তুলে বলল কৌরব ও তারা

আলাদা। তাদের সঙ্গে কৌরবদের কোন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাদের কোন রক্ত সম্পর্ক নেই। তাদের স্বার্থও আলাদা। কৌরবদের ভাই হতে তারা হিমালয় থেকে হস্তিনাপুরে আসেনি। পাণ্ডুর রাজ্য ও সিংহাসনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এসেছে। দুর্যোধনকে নির্মূল করতে না পারলে অন্তত তাকে অকেজো এবং নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার এক কূট মতলব নিয়ে এসেছে।

কিন্তু দুর্যোধন ভেবে পেল না, পাণ্ডবেরা তাদের পথের কাঁটা ভাবল কেন? কি করেছে সে পাণ্ডবদের? এ প্রশ্নের কোন কিনারা করতে পারল না। ভীমের উৎপীড়নের আতঙ্ক মনের অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়ে ছোট মা, বিদুর কি তাদের পঞ্চপাণ্ডবের অনুগত ও বাধ্য করতে চায়? হস্তিনাপুরের পরবর্তী যুবরাজ পদে যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের কোন বাধা দুর্যোধনের দিক থেকে না আসে সেজন্য কৌরব ভ্রাতাদের সহযোগিতা, সমর্থন থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতেই যেন ভীম অনুজ ভ্রাতাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতবদলের জমি প্রস্তুত করতে ভীমের দৈহিক বল, সাহস এবং নিষ্ঠুরতাকে কুন্তী ও বিদুর একটা কৌশলরূপে গ্রহণ করল। এই বিশ্লেষণটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হলো দুর্যোধনের। কিন্তু তাতে তো তার অবমাননার জ্বালা দূর হলো না। হস্তিনাপুরে তার যে একচ্ছত্র আধিপত্য পাণ্ডবদের আগমনে ক্ষুণ্ণ হলো তা তো কোনকালে আর ফিরে পাবে না। তাদের লাঞ্ছনার প্রতিকার যদি নিজেরা করতে না শেখে তাহলে পান্ডবদের হাত থেকে তাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তার মানে ভীমের অত্যাচার চিরতরে বন্ধ করার রাজনৈতিক কৌশল তাকে একা নিতে হবে। এবং খুব সাবধানে।

যেহেতু হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে এ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দুর্ঘটনা ঘটেনি। এখন যদি তা নিয়ে সংঘাত বাধে, রক্তারক্তি হয় তা হলে কৌরববংশের সম্ভ্রম নষ্ট হবে। কিন্তু মুস্কিল হলো পাণ্ডবদের নিয়ে। তারা তো সংঘাত বাধাতে হস্তিনাপুরে এসেছে। এদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলাই রাজনীতি। দুর্যোধন ভাবল পাণ্ডবদের মুখ্য অস্ত্র যদি ভীম হয় তাহলে সংঘাতে না গিয়ে কৌশলে তার সব শক্তি হরণ করে তাকে চির-

কালের জন্যে অকেজো করে রাখাই হবে প্রকৃষ্ট রাজনীতি। কিন্তু কৌশল এবং পদ্ধতিটা হবে কি?

ভীমকে গুপ্তভাবে হত্যা করার কথা মনে হলো তার। কিন্তু স্বজন হত্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে বসে শান্তি পাবে না সে। ভীম তার প্রতিদ্বন্দ্বি বটে—তাকে ঈর্ষা করে, আবার ভালোবাসেও। তাছাড়া ভ্রাতৃহত্যার কলঙ্ক তার চরিত্রকে মসীলিপ্ত করবে। তাই হত্যা করে নয়, প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে তাকে অকেজো করে দেওয়াই হবে তার রাজনৈতিক সাফল্য। ভোজনপ্রিয় ভীমকে ভোজনে প্রলুব্ধ করে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে বদ্ধ উন্মাদ করলে কেউ টের পাবে না। বরং পাণ্ডবদের জীবনে সে একটা বোঝায় পরিণত হবে। যুধিষ্ঠিরের প্রত্যাশা আচমকা একটা ধাক্কা খাবে। ভীম গেলে তাদের হেনস্তা করা, উৎপীড়ন করার আর কেউ থাকবে না। সিংহাসনের উপর তার দাবি নিষ্কণ্টক হবে। রাজ্য, সিংহাসন পাওয়ার জন্যে এরকম ছোট্ট একটা অন্যায় করা দোষের নয় কিছু।

পঞ্চান্ন বছর আগের ঘটনা। তবু কী আশ্চর্য! কি বিস্ময়—দুর্যোধন সে দিনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। অচেতন ভীমকে ধরাধরি করে সে আর দুঃশাসন গঙ্গার ধারে রেখে এল। বনান্তরালে মাটিতে তাকে শুইয়ে দিল। ভীমের দু'চোখ বোজা। নিশ্চিন্ত এবং সুখে ঘুমোচ্ছিল যেন।

সে রাতটা ঘুম হলো না তার। উৎকণ্ঠা নিয়ে সারারাত জেগে কাটাল। আশ্চর্য হলো, সারা রাত ভীম ঘরে ফিরল না, সেজন্যে পাণ্ডবদের কারো কোন উৎকণ্ঠা নেই। দুর্ভাবনাগ্রস্তও তারা নয়। কুন্তীও আশ্চর্য নীরব। বিদুরেরও কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তাদের কিছু হয়েছে, দেখে বোঝার উপায় নেই। ধৃতরাষ্ট্র কিংবা পিতামহকে ভীম সম্পর্কে তারা কিছু জানাল না। কেবল সে একা অপরাধবোধে কষ্ট পাচ্ছিল।

এক আশ্চর্য নীরবতার ভেতর আটদিন কেটে গেল। ভীম ফিরল না। তবু ঘটনাটা তারা পাঁচকান হতে দিল না। সবকিছু চেপে রাখল। যুধিষ্ঠির এবং অন্য চার ভাই মিলে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। এমন কি অচেতন ভীমকে যেখানে রেখে এসেছিল, সেখানেও ছিল না সে। তাহলে ভীমকে পাণ্ডবেরা কি লুকিয়ে

রাখল ? নইলে একজন মানুষ ঘরে ফিরল না, কোথায় গেল তার সন্ধান করল না কেন ? এমন শান্ত এবং চুপচাপ থাকছে কী করে ? মানুষ এমন নিস্পৃহ হয় ? এই নীরব রহস্যময়তার পেছনে তাদের গোপন কোন মতলব আছে বলে দুর্যোধনের ধারণা হলো। একটা নতুন বিপদের আশঙ্কায় তার ভেতরটা কন্টকিত হতে লাগল।

নবম দিনের দিন দুর্যোধনের সব জল্পনা কল্পনার অবসান করে ভীম ফিরল সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে। দুর্যোধন তাকে দেখে চমকাল। ভয়ে ভেতরটা তার থর থর করে কেঁপে গেল। বিপন্ন মুখে একটা অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে দিশেহারা হয়ে চেয়ে আছে। পঞ্চান্ন বছর পরেও বুকের মধ্যে হঠাৎ ভয়ের সেই আওয়াজটা ঠিক তেমনি শুনতে পাচ্ছিল। নিজের সেই অসহায় অবস্থাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। ঝড়ের মুখে একটা ছোট্ট বিপন্ন পাতার মতো সে কাঁপছে। কি করে যে সম্ভব হচ্ছে দুর্যোধন ভেবে পেল না।

অজান্তে তার চোখে জল এল। নিজের মনে বলল : দুর্যোধন, ভীমকে হত্যা করে যুধিষ্ঠির এবং তার ভাইদের বন্দী করে পৃথিবী শাসন করার দুর্মতি না হলে তোমার এমন দশা হতো না।

নিজের আপশোষে চমকাল। অনুশোচনা করছে কাদের জন্যে ? চিরশত্রু পাণ্ডবদের কোন ক্ষমা নেই। জীবনটা তাদের জন্যে বরবাদ হয়ে গেল। সব অশান্তির মূলে তারা। গোলমাল তো তাদের তৈরী। নইলে এত সব কিছুই হতো না। ভারতবর্ষ শ্মশান হওয়ার জন্যে তারাই দায়ী। কৌরব বংশ ধ্বংস হলো তাদের স্বার্থে।

নিন্দুকেরা যখন দায়ী করে তাকে ; একবারও ভেবে দেখে না উত্তরাধিকারীসূত্রে পিতার সিংহাসনের দাবিদার একমাত্র সে। পাণ্ডবদের তাতে কোন অংশ থাকতে পারে না। পিতা কিভাবে সিংহাসন পেল সে তো তার জানার কথা নয়। জন্ম থেকে জানে হস্তিনাপুরের রাজ্য ও সিংহাসনের ভাবী যুবরাজ সে। কোথা থেকে এসে যুধিষ্ঠির যদি তা দাবি করে বসে, সে মেনে নেবে কেন ? তার অধিকার ছাড়বে কেন ? সিংহাসনের দাবি ও অধিকার নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তার বিরোধ জমে উঠল। এই বিবাদের সূত্রেই তারা দুটি বিবাদমান দলে এবং গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেল। সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুই গোষ্ঠীর দুই বিপরীত মনোভঙ্গিও।

বুকের গভীর থেকে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অকস্মাৎ। তাতেই কেঁপে গেল তার ভেতরটা। নিজেকে দুর্যোধন যেভাবেই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করুক ভিতরে ভিতরে এক ভীষণ যন্ত্রণা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। প্রতিকারহীন যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে দিচ্ছিল। অনুতাপের সমুদ্র উথলে উঠল তার বুকে।

অভিভূত আচ্ছন্ন ভাবটা দুর্যোধনের কাটতে বেশ কিছু সময় লাগল। লাগারই কথা। এই অনুভূতির উৎস তো মনে। যে মনটা অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে। দুর্যোধনের মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে পুরনো কথা, পুরনো স্মৃতি। আর সে ডুবে যাচ্ছে তার ভেতরে। তাই কি ভেতরটা এত অধীর?

দুর্যোধনের নিজের চোখ নিজের দিকে তাকিয়ে আছে। যেখানে এক অজ্ঞাতগুহার অন্ধকার থমকে আছে। আর সেইদিকে ফেরানো দু'চোখে তারুণ্য দীপ্ত কর্ণের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছবি ভাসছে। সহসা কেমন একটা ভাবপ্রবণতায় দুর্বল হলো তার ভেতরটা। মনে মনে বলল ঃ তোমার সঙ্গে দেখা না হলে ভালো হতো কর্ণ। তোমাকে পেয়ে তো আমার যত আস্ফালন এবং ঔদ্ধত্য। তোমাকে ছাড়া বিদ্রোহী দুর্যোধন কখনো মহাযুদ্ধের নায়কের গৌরব, সম্মান লাভ করত না। তুমি আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছ। আমার সকল গর্ব, অহংকার যেমন তুমি, আমার পতন, ধ্বংসের কারণও তেমনি তুমি। আমার ইহকাল-পরকাল, জীবন-মরণ, পাপ-পুণ্য, মঙ্গল-অমঙ্গল সব তুমি।

কর্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটা সে ভোলে নি। আচার্য দ্রোণের আশ্রমে পিতা অধিরথের সঙ্গে কর্ণ এসেছিল অস্ত্রশিক্ষা করতে। দেখামাত্র ভালো লেগে গেল তাকে। মনে হলো, তার সঙ্গে অনেককালের সম্পর্ক। তাড়াতাড়ি ভাব হতে দেরি হলো না। অল্পেই কর্ণ দুর্যোধনের প্রাণে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসল। একটা উষ্ণ অনুরাগের স্রোত বয়ে গেল শিরায় শিরায়। বুকটাও উদ্বেলিত হলো। প্রথম দর্শনেই তাদের ভেতর একটা নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। আলাপের সেই মুহূর্তটা দুর্যোধন ভোলেনি।

অস্ত্রশিক্ষার তালিম দিচ্ছিলেন আচার্য দ্রোণ। রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদে শোভিত হয়ে কৌরব ও পাণ্ডব ভ্রাতারা দ্রোণের

নির্দেশ মতো লক্ষ্য বিদ্ধ করছিল। অস্ত্র নিয়ে কেউ তার প্রয়োগ কৌশল মুনসিয়ানা রপ্ত করছিল। এদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী কর্ণের নজর কেড়ে নিল। কী অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় একের পর এক শর নিক্ষেপ করছে। নিক্ষিপ্ত শরগুলো শ্রেণীবদ্ধ বলাকার মতো নীল আকাশের গায়ে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছিল। সূর্যের আলো পড়ে তীরের ফলাগুলো ঝকমক করছিল। কর্ণের ভেতরটা ভীষণ খুশী হয়ে উঠেছিল। বিস্ময়টা সে চেপে রাখতে পারছিল না। দুর্যোধনকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল ঃ কে ঐ অদ্ভুত দর্শনীয় রাজকুমার? ও কে?

দুর্যোধন বলল : ও হলো তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন আমার পরম শত্রু। দুর্ভাবনা ওকে নিয়ে। কিন্তু অর্জুন আচার্যের গর্ব এবং অহঙ্কার। অর্জুনের সমকক্ষ বীর এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আচার্য দ্রোণের পছন্দ নয়। একবার কৃষ্ণকায় এক নিষাদ যুবক একলব্য তীর নিক্ষেপের নৈপুণ্যে অর্জুনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পাছে নিষাদ যুবক অর্জুনকে ছাড়িয়ে যায় তাই আচার্য গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ তার বৃদ্ধাঙ্গুলটি দিতে বললেন। বৃদ্ধাঙ্গুলি গেলে তীরন্দাজের থাকল কি? একটা দুর্লভ প্রতিভাকে শুধু অর্জুনের জন্যে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেন। অথচ, সে জন্য আচার্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নন।

কর্ণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলল ঃ অর্জুন, অর্জুনই। তার বিকল্প সত্যিই হয় না। না হোক, আমি অর্জুনকে ছাড়িয়ে যাব। এ আমার প্রতিজ্ঞা।

দুর্যোধন কর্ণের দিকে চেয়ে মুখে চুকচুক করে শব্দ করল। বলল : অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার সাধ থাকলে তোমাকেও একলব্যের মতো বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরুদক্ষিণা দিতে হবে। তুমি পালাও।

কর্ণ বলল ঃ ভয় পেয়ে চলে যাব? ভয় কাকে বলে জানি না। বেচারা একলব্যের কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছি। প্রতিভার সমাদর করা এবং তার গৌরব বাড়ানো একজন আচার্যের কর্তব্য। কিন্তু সে কথা ভুলে তিনি যদি একজন ঘাতক হয়ে উঠেন তা-হলে তাঁর কাছে শেখার সত্যি কিছু থাকে না। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে,

অর্জুনের সমকক্ষ হয়ে উঠার কোন সুযোগ আচার্য আমাকে দেবেন না। তবু তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে সংশয়মুক্ত হতে চাই।

কর্ণের গমন পথের দিকে দুর্যোধন মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে রইল। এ বয়সেই নিজের প্রতি তার কী গভীর আস্থা! প্রবল আত্মপ্রত্যয়। চোখে মুখে তার সংকল্পের দৃঢ়তা। কর্ণকে দুর্যোধনের ভীষণ ভালো লেগে গেল। অর্জুনের সমকক্ষ বীর এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার জেদ এবং জোর তার ভেতরে দেখল। কর্ণের ভেতর একটা আগুন আছে। ঠিক মতো ইন্ধন পেলে এই যুবকই অর্জুনের দম্ভ এবং স্পর্ধার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। এর সঙ্গে বন্ধুত্ব গভীর হলে তখন অর্জুনকে ভয় পাওয়ার কিছু থাকবে না। কর্ণের মুখেই শুনল, ভাগ্য বলে কিছু নেই। ভাগ্য মানুষের নিজের হাতে তৈরী হয়। যে যেমন কাজ করে তেমন তেমন ফল পায়।

কর্ণ এক অদ্ভুত যুবক। যত দিন যেতে লাগল কর্ণ তাকে চমৎকৃত করল। অর্জুনের প্রতি বেশি প্রীতি দেখানোর জন্যে আচার্য দ্রোণের উপর তার কোন ক্ষোভ ছিল না। অর্জুনের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার স্বপ্ন কর্ণের। কিন্তু সেজন্যে তার কোন ঈর্ষা নেই। বরং উল্টে বলে শুধু ঈর্ষা করে কি সমকক্ষ হওয়া যায়? সমকক্ষ হওয়ার জন্যে চাই উদ্যোগ, সাধনা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং নিরন্তর অনুশীলন। ঈর্ষা হলো মানুষের এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ। নিজেকে কারো অপেক্ষা ছোট ভাবলে তবেই ঈর্ষা হয়। অর্জুনের চেয়ে নিজেকে হীন মনে করার মতো কোন কারণ ঘটেনি।

কর্ণের ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য দুর্যোধনকে মুগ্ধ করল। তবু তাকে বাজিয়ে নেয়ার জন্যেই তার ভাবপ্রবণতার সমালোচনা করতে ছাড়ল না। বলল, ভাবপ্রবণতার আলো পড়ে তোমার হৃদয়টা বড় হয়ে আছে। ভাবছ, এভাবে আচার্যের স্তুতি করলে তিনি তোমার প্রতি সদয় হবেন। কিন্তু তোমার অনুমান ভুল। নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকেও যে মানুষ অর্জুনের সমকক্ষ হয়ে উঠতে দিলেন না, তোষামোদ কিংবা চাটুকারিতা করে তাঁর কাছে কিছু আদায় করতে পারবে না। তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা মরীচিকা মাত্র।

তবু কর্ণ মাথা নাড়ে। হাসে। বলে : না, তা হবে কেন? অনুশীলন, অধ্যাবসায়, সাধনা নিষ্ঠা নিজস্ব সম্পদ। সে কেউ দিতে পারে না, কেড়ে নিতেও পারে না। নিষাদপুত্র একলব্যই তার আদর্শ। আচার্য তার বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরুদক্ষিণা নিয়ে অর্জুনকে সবার চোখের সামনে ছোট করে দিয়েছেন, নিজেও বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে আছেন। আচার্যের প্রাজ্ঞ মনটি তো জানে, আগুন যেমন চাপা থাকে না, প্রতিভার বিকাশ তেমনি কারো মুখাপেক্ষি থাকে না। এক জায়গায় জ্বলে উঠার পথ না পেলে আর এক জায়গা খুঁজে নেবে। ও নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। আর আমি একলব্যও নই। অর্জুনকে আমি হারিয়ে দেব। তার চেয়েও বড় হব। সবার নজর কেড়ে নেয়ার অপরাধে যদি আচার্য ত্যাগ করেন, তা-হলে অন্য আচার্য খুঁজে নেব। মনের মতো গুরু না পেলে একলব্যের মতো আচার্যের মূর্তি সামনে রেখে অনুশীলন করব। সত্যিকারের সাধনা ব্যর্থ হওয়ার নয়।

উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে দুর্যোধন কর্ণকে জড়িয়ে ধরল। এক গভীর সুখে তার হৃদয়টা ভরে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইল। আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বলল : বন্ধু, তুমি আমার গর্ব, অহংকার। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। অনেককালের একটা ভয়, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা থেকে তুমি আমাকে বাঁচালে। অর্জুনকে আমার আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তুমি পারবে। তোমার ভেতর যে আগুন জ্বালছে, সে আগুনে অর্জুনের গর্ব, অহংকার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কর্ণ বেশ একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল : এ কথা বলছ কেন?

আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে দুর্যোধন তার হাত দুটি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে বলল : বন্ধু আগুন খোঁচালে নেভে না, দাউ দাউ করে জ্বলে। তুমিও আচার্য দ্রোণের অনাদর, অবহেলা, তাচ্ছিল্য পেয়ে শুধু জ্বলে উঠবে। তখন তুমি যথার্থ প্রকাশ পাবে।

আমি সহজ সরল মানুষ। সোজা কথাটা সোজাভাবেই বুঝি। হেঁয়ালী বুঝি না।

বন্ধু, যোগ্যতার মূল্য না পাওয়া, প্রাপ্য মর্যাদা এবং গৌরব

থেকে বঞ্চিত হওয়া কিংবা পক্ষপাতিত্ব করে কাউকে দাবিয়ে রাখার মতো বড় অপমান কিছু নেই। সহজ সরল মানুষ বলেই তুমি আচার্যর কপটতা বুঝতে পার না। কিন্তু আমরা তাঁকে চিনি। অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কোন সুযোগ তুমি পাবে না। প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। হতাশায়, নৈরাশ্যে তোমার ভেতরকার তেজ একদিন নিভে যাবে। নিজের মনের আগুনে পুড়ে পুড়ে তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাই হয়ে যাবে। সেই ভয়ঙ্কর দিন আসার আগে তুমি পালাও। আচার্যের সঙ্গে তোমার আকাঙ্ক্ষার একটা আপোষ বোঝাপড়া করে নাও। বন্ধু, অন্তহীন প্রত্যাশা নিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে আছি আমি। তোমাকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। অর্জুনের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তোমাকে যতক্ষণ না পাচ্ছি, আমার সাধ পূরণ হবে না। বন্ধুর কাছে এই ছোট প্রত্যাশা করা কি খুব বেশি চাওয়া?

কর্ণ অবাক হয়ে চেয়েছিল দুর্যোধনের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না সে। তারপর ধীরে ধীরে বলল: তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্পদিনের। এর ভেতর তুমি কত ভালোবেসে ফেলেছ আমাকে। আমার কাছে কারো প্রত্যাশা থাকতে পারে কল্পনাই করিনি। অথচ তুমি কাঙালের মতো আমার জন্যে আমার কাছে প্রার্থনা করছ। তোমার এত তীব্রভাবে চাওয়াটাকে 'না' বলতে বুক ভেঙে যায়। তোমার আমার একান্ত চাওয়া, পাওয়ায় পর্যবসিত হলে তবে এ মুখ দেখবে।

কর্ণের অনেক কাল কোন খবর ছিল না। রাজপুত্রদের অস্ত্র-পরীক্ষার রঙ্গভূমিতে অভিনব অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করে অর্জুন যখন সকলকে চমকে দিল, কৌরবদের কৃতিত্ব যখন ম্রিয়মান, হীনমন্যতার অপমানে দুর্যোধনের বুক জ্বালা করছিল, তখনই ধূমকেতুর মতো জনতার মধ্যে উদয় হলো কর্ণ। তার নাটকীয় প্রবেশ সকলকে চমকে দিল। হুঙ্কার দিতে দিতে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করল। বলল: অর্জুন বন্ধ কর তোমার নাটক। তোমার অস্ত্র প্রদর্শনের চটকে বাহবা পাওয়ার কিছু নেই। তোমার চেয়েও কৃতিত্বের অধিকারী এ রঙ্গভূমিতে আছে। তাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে তোমার কৃতিত্ব প্রমাণ কর। তোমাদের কাছে আমি খুব একটা অপরিচিত

নই। আচার্য পরশুরামের শিষ্য কর্ণ আমি। আচার্য দ্রোণ কৌশলে সকলকে বোকা বানিয়ে জনতার হাততালি কুড়িয়ে তোমাকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরের শিরোপা দিলে। অস্ত্র পরীক্ষার নামে খেলা করছেন তিনি। পরশুরামের শিষ্য আচার্য দ্রোণের ছায়ায় লালিত পালিত বীর পুঙ্গব তৃতীয় পাণ্ডবকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করবে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আমাকে অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ করুন।

চমৎকৃত হলো দুর্যোধন। দৌড়ে গিয়ে কর্ণকে আলিঙ্গন করল।

স্তব্ধ বিস্ময়ে রঙ্গভূমি থমথম করছিল। ধৃতরাষ্ট্র অনুমতি দিলে, আচার্য কৃপ বলল ঃ তা কেমন করে হয়? এ হলো রাজপুত্রদের অস্ত্রপরীক্ষার রঙ্গভূমি। এখানে অজ্ঞাতকুলশীলদের কোন স্থান নেই।

দুর্যোধন দু'চোখ কপালে তুলে বলল ঃ অধিরথও সামন্ত রাজা। তৎসত্ত্বেও আমার অঙ্গরাজ্যে কর্ণকে এই মুহূর্তে রাজপদে অভিষেক করছি। তা-হলে তো কুলশীলমান অর্জুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো। অর্জুনের সঙ্গে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তো তার আর বাধা থাকল না।

কৃপের অধরে চতুর হাসি। ভুরু কুঁচকে বলল ঃ কর্ণ অধিরথের পুত্র। অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির সঙ্গে কুলশীলমানে বড় রাজবংশের রাজপুত্রের কোন যুদ্ধ হয় না।

দুর্যোধন সহসা অট্টহাস্য করে উঠল। বলল ঃ আচার্য ; আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। অপ্রিয় সত্য কথা বলার জন্যে দুর্যোধন দুর্মুখ, উদ্ধত। লঘু-গুরু মানে না এসব অপবাদ এবং দুর্বাক্য প্রায় শুনে থাকে। দুরাত্মা বলেও আপনারা তাকে গালি দেন। আপনাদের গালমন্দ সত্ত্বেও আমার রসনা সংযত হলো না। এটা দুর্ভাগ্য আমার। আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা ঃ পাণ্ডবেরা কি অজ্ঞাতকুলশীল নয়? হস্তিনাপুরের রাজপরিবার তাদের জন্মবৃত্তান্তের কোন সংবাদ জানে না। তারা কার পুত্র, কি তাদের অধিকার তার সঠিক তথ্য কেউ জানে না। আচার্য আপনাকেও বনপথ থেকে কুড়িয়ে এনে প্রপিতামহ শান্তনু

পালন করেছেন। আচার্য দ্রোণ বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে নলজাত মানুষ। তবু আপনারা নিজ নিজ কৃতিত্বের জোরে সমাদৃত হয়েছেন। সর্বলক্ষণযুক্ত কর্ণও আপনাদের মতো সমান কৃতিত্বের অধিকারী। তাহলে যোগ্য সমাদর পাবে না কেন? কর্ণের অপরাধ কী? অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাওয়া তার অপরাধ? জন্মগত পরিচয়ে অর্জুন এবং কর্ণের পার্থক্য কোথায়? কিন্তু উভয়েই তাদের জন্ম থেকে আপন কৃতিত্বে বড় হয়ে উঠেছে। তথাপি, অর্জুনকে বড় করে কর্ণকে ছোট এবং হেয় করে দেখার এতবড় স্পর্ধা আপনাদের হলো কী করে?

কৃপাচার্যের দু'চোখ ক্রোধে ধক্ ধক্ করছিল। কম্পিত গলায় বলল: তোমার মতো দুরাত্মাই এমন কথা বলতে পারে।

দুর্যোধন অদ্ভুত ভঙ্গী করে হাসল। উদ্ধত গলায় বলল: আচার্য ধর্মাত্মা বিদুরের কথা প্রতিধ্বনি করে বলি সত্যকে চাপা দেয়া যায় না। আবার তাকে হত্যা করাও যায় না। মানুষ তার জন্মের চেয়েও বড়। বারাঙ্গনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেও বশিষ্ঠ মহর্ষি বশিষ্ঠ থেকে গেল।

এসব তর্কাতর্কির মধ্যে কুন্তী সহসা মূর্ছা গেল। অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেল না কর্ণ। কিন্তু কর্ণকে পেয়ে দুর্যোধনের অর্জুনভীতি একেবারে চলে গেল। ভীমকেও তার ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। বেশ একটা স্বস্তি আর প্রসন্নতা নিয়ে কর্ণের হাত ধরে রঙ্গভূমি থেকে গৃহে ফিরল।

দুর্যোধনের ঘুমটা গাঢ় হলো না। কেবল উশখুশ করছিল। পাশ ফিরতে গিয়ে সারা শরীর ব্যথায় টনটন করল। বোজা চোখ একটু খুলল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই মনে হলো সে জেগে আছে। জাগরিত অবস্থায় যেন দেখছে হস্তিনাপুরের রাজসভায় যুধিস্ঠিরের অভিষেক হচ্ছে। রাজ-কর্মচারী এবং আত্মীয়স্বজনেরা উপস্থিত। বাইরের কোন নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ নেই। আচার্য দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের মস্তকে মুকুট পরিয়ে দিল।

গলা থেকে অদ্ভুত এক কাতরানোর শব্দ বের হলো। যন্ত্রণাদীর্ণ অসহায় আর্তি তার স্বরে স্পন্দিত হচ্ছিল। সমস্ত দেহ মন যেন কেঁদে কেঁদে উঠছিল। তীব্র অসহনীয় এক কষ্টে বুকের ভেতরটা বিদীর্ণ হতে লাগল। ভীষণ কান্না পেল।

ঘুমন্ত অবস্থাতেই দেখতে পাচ্ছিল ভেতরকার সব কষ্ট, হাহাকার, যন্ত্রণার শব্দকে প্রাণপণে আটকে রাখতে দুটো দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট কামড়ে রইল। দুর্যোধন স্পষ্ট দেখতে পেল পাছে সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় হেরে যায়; সকলের সামনে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ে তাই চুপি-চুপি রাজসভা ছেড়ে উঠে যাচ্ছে। আর পিছন পিছন কর্ণ দৌড়ে আসছে।

কণ্ঠস্বর দরদে মাখ মাখ করে কর্ণ বলল ঃ বন্ধু এ রকম একটা শক্ত প্রতিবাদ আমি চেয়েছিলাম। চীৎকার চেঁচামেচি করে প্রতিবাদ জানানোর চেয়ে নীরব প্রতিবাদ অনেক বেশি অর্থ বহন করে। প্রতিবাদ যখন নীরব থাকে তখনই সবচেয়ে তা ভয়ঙ্কর। তোমার এই রাজনৈতিক চালটা ভালো হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের চিন্তা বেড়ে গেল তোমাকে নিয়ে।

দুর্যোধন মুখ না ফিরিয়ে বলল ঃ পুতুলের মতো বসে থাকতে নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছিল। নিজেকে অপমান করার ভেতর কোন উদারতা নেই। আমার চাওয়া-পাওয়ার ভেতর কোন বিরোধ নেই। আমি যা চাই হয় তা পাব, না হলে ধ্বংস করব—কিন্তু অন্যকে কেড়ে নিতে দেব না। না-আ-আ। কাতরানো গলায় টেনে টেনে বলল। তাতেই ঘুম ভেঙে গেল দুর্যোধনের। চোখ মেলে দেখল সুড়ঙ্গের ধাপে একা সে। চারপাশে কেউ নেই।

দুর্যোধনের আকস্মিক অন্তর্ধান কৃষ্ণকে ভাবিয়ে তুলল। যুধিষ্ঠিরের মনেও যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। এভাবে হঠাৎ তার উধাও হয়ে যাওয়ার ভেতর কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে মনে হলো কৃষ্ণের। দুর্যোধন যুদ্ধবাজ। যুদ্ধের জয়-পরাজয় দিয়ে যে মীমাংসা হয় তার বিশ্বাস করে। কৃষ্ণ তার অন্তর্ধানের ভেতর আরো একটা

বড় যুদ্ধের গন্ধ পেল। এই আশঙ্কাটা তার মনে শিকড় গেঁড়ে বসল।

আর কেউ না জানলেও কৃষ্ণ তো জানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা তার স্বর্থেই হয়েছে। শেষমুহূর্তে যুদ্ধটা বন্ধ হোক, দুর্যোধনও চেয়েছিল। কিন্তু সে চায়নি বলেই দুর্যোধনকে অপমান করে শান্তির পরিবেশ বিষিয়ে দিল। দুর্যোধন তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথে কাঁটা। তাকে চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই কৌরব পান্ডবের রেষারেষি এবং কোন্দলকে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে টেনে আনল। দুর্যোধনের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতেই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলল। দেবভূমি থেকে বহু উন্নতমানের দেব-অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল অর্জুন। ঐসব অস্ত্র ব্যবহার করে দুর্যোধনের আকাশচুম্বী স্পর্ধা ধূলিসাৎ করাই ছিল লক্ষ্য, যাতে ভবিষ্যতে দুর্যোধনের উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা না থাকে; তার ক্ষমতার আস্ফালন এবং ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ার স্বপ্ন যাতে চিরদিনের মতো শেষ হয়।

দুর্যোধন তার বড় শত্রু। ভারত রাজনীতিতে তার আধিপত্য বিস্তারের পথে বাঁধা। তার সঙ্গে প্রকাশ্য কোন বিবাদ করেনি সে। বরং বিবাদ এড়িয়ে চলাই ছিল দুর্যোধনের নীতি। তবু কৃষ্ণের প্রতিপত্তির উপর নিঃশব্দে আঘাত হেনেছে। আসলে সে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রবল প্রতিপক্ষ, পরম শত্রু কৃষ্ণকে ঘূণাক্ষরে জানতে দেয়নি। কৃষ্ণও বুঝতে দেয়নি দুর্যোধনকে ঈর্ষা করে। ঈর্ষার কারণ জরাসন্ধের মৃত্যুর পরে ভারত রাজনীতিতে দুর্যোধনের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তার আসনটি নিঃশব্দে তার দখলে চলে গেল। কৃষ্ণও তার রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়ল। দুর্যোধন জরাসন্ধের মতো যুদ্ধ করে নয়, প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি স্থাপন করে, পারস্পরিক সহযোগিতা, বিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করল। লোকচক্ষুর আড়ালে এক আদর্শ জোট গড়ে তুলল। তার ঐক্য ও সংহতিতে চিড় ধরানো ছিল অসম্ভব। দুর্যোধন এমন গুছিয়ে ভারত রাজনীতিতে একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠল যে কৃষ্ণ মনে মনে

ভীত হয়ে পড়ল। যাদব রাজ্যের স্বার্থও ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হলো। দুর্যোধন তার তোয়াক্কা না করে অনুগত এবং বান্ধব পান্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে বিতাড়িত করে দেখাল কৃষ্ণ নয়, ভারত রাজনীতির নিয়ামক সে। কৃষ্ণ তার যে প্রতিপক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী খুব ঠাণ্ডাভাবে এবং শক্ত করে কথাটা কৃষ্ণকে জানিয়ে দিল।

দুর্যোধনের আসল বিরোধ কৃষ্ণের সঙ্গে। পাণ্ডবেরা উপলক্ষ্য। বিরোধ কর্তৃত্ব নিয়ে। কে কতখানি রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারল, নিয়ন্তা হয়ে উঠল তাই নিয়ে দুর্যোধনের সঙ্গে তার এক নীরব নিরন্তর সংঘর্ষ।

এই সংঘর্ষ পুরনো। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তা এক নতুন মাত্রা পেল। কে বা কারা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এবং বিপক্ষে, তাদের মতিগতি বা অভিপ্রায় কি, তার পাকা হিসাব নিকাশ করতে জরাসন্ধের অনুগত ও সমর্থক রাষ্ট্রজোট খেলোয়াড়োচিত উদার মনোভাব নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নির্বিঘ্নে ধর্মপালন করতে দিল। কৃষ্ণও সুচতুরভাবে যজ্ঞ সুসম্পন্ন করার পরিকল্পনা করল। দুর্যোধনের দিক থেকে এবং তার অগুগত বান্ধব ও আত্মীয়দের কাছ থেকে কোনরকম বাধা যাতে না আসে সেজন্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবিধ কর্মের দায়িত্ব ও তদারকির ভার সুষ্ঠভাবে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিল এবং ভারত রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচনের দায়িত্ব জরাসন্ধ রাষ্ট্রজোটের সর্বাগ্রগণ্য এবং সর্বজনমান্য, বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় পিতামহ ভীষ্মকে অর্পণ করেছিল যুধিষ্ঠির। তার চতুর পরিকল্পনা অনুসারে সব ঠিক ঠিক হলো।* শ্রেষ্ঠব্যক্তির খেতাবটি পিতামহ তাকে ছাড়া অন্য কাউকে যে দেবে না কৃষ্ণ জানত। শিশুপালই তার চালাকিটা ধরে ফেলে তীব্র প্রতিবাদ করল। ধিক্কার দিল। নিন্দেয় মুখর হলো।

কৃষ্ণ তার সঙ্গে তর্ক করল না। আপোষেও গেল না। বরং কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার এক নৃশংস উদাহরণ স্থাপনের জন্যে পাশের ঘরে ডেকে এনে তাকে

* মৎ লিখিত ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ দ্রষ্টব্য।

হত্যা করল। জরাসন্ধের পরে শিশুপালক সরিয়ে দিয়ে দুর্যোধনের মনোবল আঘাত করল। আশা করেছিল, দুর্যোধনকে অন্তত ব্যক্তিগতভাবে তার ও পাণ্ডবদের কাছে কিছুটা নতিস্বীকার করানো যাবে। কিন্তু দুর্যোধনের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তার আত্মম্ভরিতার দুর্গে একটু ফাটলও ধরল না তাতে। বরং খুব শান্ত এবং সংযতভাবে বলল ঃ একটা শিশুপালের জায়গায় আর একটা শিশুপাল আসবে। নৃশংসতার উদাহরণ তৈরি করে শত্রুতার শেষ হয় না। বরং একটা অনর্থক বিপদের মুখে নিজেদের সম্পর্ককে টেনে আনা হয়। অস্তিত্ব রক্ষার্থে তখন ঐক্যবদ্ধ হওয়া সহজ হয়।

দুর্যোধনের প্রতিক্রিয়া কৃষ্ণের কানেও পেঁছিল। শিশুপালকে হত্যা করে সে কোন ভুল করেনি। কে বা কারা তার বিপক্ষে ভালো করে জানা ও চেনার জন্যে তো এক মঞ্চে সব বিরোধীদের হাজির করল। তবু মনে শান্তি ছিল না। শ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্ঘ্য লাভ করেও মনে আনন্দ ও সুখ ছিল না। তাকে সর্বক্ষণ চিন্তাচ্ছন্ন দেখে প্রিয়সখি দ্রৌপদী পিতামহের কণ্ঠস্বর নকল করে কৌতুক করল—বাসব আজ বড় খুশির দিন। যুধিষ্ঠির তোমাকে ভারতরত্ন নির্বাচন করে উচিত কাজই করেছে। ভারত রাজনীতির গৌরব বাড়াতে, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ এবং বৈষম্যের অবসান ঘটাতে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে, হেন কাজ নেই কৃষ্ণ করেনি। মানবজাতির ত্রাণকর্তা হয়ে এসেছে সে। তাকে ভারতবর্ষের সমগ্র নৃপবর্গ মান্য করে এবং শ্রদ্ধা করে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সকলের মিলিত আবেগ ও অনুরাগের কণ্ঠে বরমাল্য দিতে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠপুরুষ নির্বাচন করেছেন। কৃষ্ণ যথার্থই পুরুষোত্তম। শ্রেষ্ঠ মানুষের অর্ঘ্য পাওয়ার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। এই অনুষ্ঠানে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত করার দায়িত্ব যুধিষ্ঠির আমাকে অর্পণ করে ধন্য করেছে। কৃষ্ণের গৌরবে আমি গর্ব অনুভব করছি। তার কল্যাণ হোক। জয় হোক।

দ্রৌপদীর উৎফুল্লতায় কৃষ্ণ উল্লসিত হলো না। বরং গম্ভীর গলায় বলল ঃ প্রিয় সখি উল্লাসিত হওয়ার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

কারণ গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে যে এক বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছিল সেই জরাসন্ধের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়ে দুর্যোধন এখনও ক্ষমতায় রয়েছে। ইন্দ্রপ্রস্থকে হস্তিনাপুরের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করা এবং ভারত রাজনীতির নেতৃত্ব থেকে তাকে সরানোর লক্ষ্য এখনো পূর্ণ হয়নি। সখি, ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে আমি যতই ধর্ম ধর্ম করি না কেন আমার মূল লক্ষ্য দুর্যোধনকে সরানো। তার উড়বার পাখাটাকে কেটে দেয়া।

দুর্যোধনের উপর তার রাগ কেন, সে কথা তো আর প্রিয় সখিকে বলার নয়। কিন্তু দ্রৌপদী কি বুঝল নিজেই জানে। বলল ঃ সখা আমাদের জন্যে তুমি খুব ভাব তাই না? পাণ্ডবদের স্বার্থ নিরাপদ এবং নিশ্ছিদ্র করতে কত দিকে কত ভাবে নজর রাখ। তোমার মতো বন্ধু না হলে পাণ্ডবদের যে কী দুর্দশা হতো কে জানে?

কৃষ্ণ দ্রৌপদীর কালো চোখের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসল। সব কথা তো আর সকলকে বলা যায় না। কিছু কিছু কথা থাকে একান্ত নিজের। নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যে পাণ্ডবের মতো নিরীহ, বিশ্বস্ত, কৃতজ্ঞ, অনুগত, নিঃসম্বল, নির্বান্ধব, স্বজনহীন, নিরাশ্রয় মানুষকে বেছে নিয়েছিল। বহু আকাঙ্ক্ষিত ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তার আসনটি সম্রাট জরাসন্ধের হাত থেকে দখল নিতে পারলে পৃথিবীর মানুষ তাকে পূজো করবে। তার এই মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারে কেবল পাণ্ডবেরা। তারা বড় একা এবং অসহায়। কৃষ্ণের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে। বিনিময়ে তারাও কৃষ্ণের জন্য কিছু করতে চায়। স্বার্থশূন্য দান হয়তো নয়। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে সংঘর্ষে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যাদব রাজ্যের সমর্থন এবং কৃষ্ণের বন্ধুত্ব তাদের কাছে খুব বড়। তাদের বিশ্বস্ত অনুরাগই কৃষ্ণের শক্তির উৎস।

মধ্যম পাণ্ডব তো তার মন রাখতে ন্যায়, অন্যায় বিচার বিসর্জন দিয়ে সম্রাট জরাসন্ধকে হত্যা করল। রাজসূয় যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ দিয়ে এক নতুন ভারতরাষ্ট্র এবং জাতি-সংঘ গঠনের নেতৃত্ব অর্পণ করল। কিন্তু মূল লক্ষ্য তাতে পূরণ

হলো না তার। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে জরাসন্ধ গোষ্ঠীকে সরানো গেল না। পাণ্ডব সখা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠব্যক্তির অর্ঘ্য লাভের কাঙালপনাকে তারা ধিক্কার দিল। দুর্যোধন আগের মতোই পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। সদর্পে আস্ফালন করে বলল ঃ ধর্মের নামে যুধিষ্ঠির আমাদের সকলের সঙ্গে কপটতা করেছে। একদিন এর মূল্য দিতে হবে তাকে। কোনো রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

কৃষ্ণ জানে, দুর্যোধনের এ হুংকারের লক্ষ্য যুধিষ্ঠির নয়। পরোক্ষভাবে তাকেই শাসিয়েছে। এযেন কৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের আগাম সতর্কবাণী। কৃষ্ণ প্রাণ পাণ্ডবদের তোয়াক্কা না করার মানে হলো যাদব রাষ্ট্রপ্রধান কৃষ্ণের নেতৃত্বকে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য করা। দুর্যোধনের সঙ্গে তার বিরোধের সূত্রপাত সেই থেকে। কিন্তু তাদের লড়াই ছিল কৌশলগত এবং প্রচ্ছন্ন। কে কার উপর কতখানি স্নায়ুচাপ সৃষ্টি করে তার এক ঠাণ্ডা লড়াইর প্রতিযোগিতা ছিল তার ও দুর্যোধনের ভেতর।

কার্যত দুর্যোধনের দূরদর্শিতা, এবং কৌশলের কাছে সত্যিই হেরে গেছে সে। এই হার বাইরে থেকে কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু সে দেখতে পায়। তখন লজ্জা হয়।

হঠাৎ কৃষ্ণের ভাবনায় ছেদ পড়ল। মনটা বড় দীন হয়ে গেল। মাথামোটা, বাস্তব বুদ্ধিহীন, গোঁয়ার বলে যে গাল মন্দই করুক তার পাশে দুর্যোধন প্রকৃতই পরিণত, স্থিতধী, গভীর ভাবনার মানুষ। তাই তো যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই সে গা ঢাকা দিল। জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও বাকি। পাণ্ডবদের চমকে দিয়ে একদিন যে আবার পাণ্ডবদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? কিন্তু একনায়কদের চরিত্রটাই এরকম। তারা ভাঙলেও মচকায় না। দেয়ালে পিঠ ঠেকলেও হাঁটু ভেঙে আত্মসমর্পণ করে না। বরং ভাবলেশহীন মুখে সম্মান, মর্যাদা, ভাবমূর্তির কথা চিন্তা না করে অনায়াসে আত্মগোপন করতে পারে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশে বিশ্বাসী। তাই দুর্যোধনের আত্মগোপনের ভেতর একটা অশুভকে কৃষ্ণ দেখছিল। এখন না হলেও, আবার একটা বড় যুদ্ধের আঁচ পেল কৃষ্ণ।

দুর্যোধনকে কিছুতে জীবিত রাখা যাবে না। শিশুপালের মৃত্যুর মতো আরো একটা নৃশংস হত্যার উদাহরণ তৈরী করতে সে দ্বিধা করবে না। কৃষ্ণ শত্রুর শেষ রাখে না। এই একটি প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে আছে সমস্যা। দুর্যোধনকে যে করে হোক তল্লাশি চালিয়ে বার করতে হবে। তার বেঁচে থাকার পরের দিনগুলি কি ভয়ংকর হ'তে পারে তার কথা ভাবলে কৃষ্ণের গা শিউরে উঠে। দুযোধন আত্মগোপন করে সেই ভয়ংকর দিনগুলি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তাদের মধ্যে ফিরে আসবে।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করল কৃষ্ণ। সারা গা দিয়ে একটা তাপের হলকা বেরোচ্ছিল। এসব কথা যুধিষ্ঠিরকে বলে লাভ নেই। এতো তার নিজের সমস্যা। নিজেকেই সমাধান করতে হবে একা। কৃষ্ণের খুব কাছেই যুধিষ্ঠির দাঁড়িয়ে ছিল। তার উদাস, অন্যমনস্ক দুই চোখের উপর চোখ পেতে রেখেছিল। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে দেখ-ছিল না। অদ্ভুত দ্রুততায় মাকড়সা শিকার ধরার জাল বুনছিল। কৃষ্ণ একদৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়েছিল।

কৃষ্ণের অদ্ভুত নীরবতায় যুধিষ্ঠির বেশ একটু অবাক হলো। তাকে কিছু প্রশ্ন করতে গিয়েও দ্বিধা করল। কৃষ্ণের চোখে মুখে একটা অস্বস্তিকর উদ্বেগ লক্ষ্য করল। তার নিজেরও উৎকণ্ঠা বাড়ল। কী যেন বলি বলি করেও সামলে নিয়ে বলল ঃ কৃষ্ণ তুমি নতুন কোন সংকটের কথা ভাবছ কি?

যুধিষ্ঠিরের অদ্ভূত প্রশ্নে কৃষ্ণ আশ্চর্য হলো। কয়েক পলক তারা পরস্পরের দিকে নিজের নিজের বিস্ময় এবং প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে রইল। গম্ভীরভাবে বলল ঃ এখন কিছু বুঝতে পারছ না তুমি?

দোটানার মধ্যে পড়ে অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল যুধিষ্ঠির। তার মুখে একটা অজ্ঞতাজনিত অপরাধ অপরাধ ভাব। কৃষ্ণ আস্তে আস্তে বলল ঃ যুদ্ধ কি শেষ হয়েছে? কার জয় হলো? হারল কে?—কিছু জানো?

যুধিষ্ঠির সবিনয়ে বলল ঃ যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই জয়। আমরা জয়ী।

ভুরু যুগল সহসা কুঞ্চিত হলো কৃষ্ণের। বলল ঃ এই জয় নিয়ে

তুমি গৌরব কর? যুদ্ধ কি শেষ হয়েছে? কার জয় আর কার পরাজয় এখনো আমরা জানি না। দুর্যোধন এখনো জীবিত। কৌরবপক্ষের সব সৈন্যরা মরেনি। আক্রমণের মুখে তারা পালাতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রেও শেষ মুহূর্তে দুর্যোধনকে আর দেখা যায়নি।

যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠস্বরে যুগপৎ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল। বলল ঃ দুর্যোধন পলাতক। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। বিধ্বস্ত কৌরব শিবিরে একজন জীবিত সৈনিকেরও দেখা পায়নি। শিবির শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। তাদের চোখের সামনে দিয়েই কৌরব শিবির সদ্য বিধবা ভ্রাতৃবধূরা বুক চাপড়ে, চুল টেনে কাঁদতে কাঁদতে ভৃত্যদের সঙ্গে খচ্চরের রথে চেপে হস্তিনাপুরের দিকে ফিরে চলেছে। সখা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বোধহয় এরাই সবচেয়ে বেশি হারাল। ওদের কথা ভাবলে আমার ভেতরের সব উত্তেজনা, প্রতিহিংসার আগুন নিভে যায়।

সখা, সিংহাসনে বসবে না? দুর্যোধনকে খুঁজে বার করতে না পারলে সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু সংশয় থেকে যায়। যে রাজ্য লাভের জন্যে, সিংহাসনের জন্যে এত বড় লোকক্ষয়ী যুদ্ধ দুর্যোধন নিধন ছাড়া সেই রাজ্যলাভ মোটেই নিষ্কণ্টক হওয়ার কথা নয়। এখন তুষ্ট হওয়া কিংবা ভাবাবেগ দেখানোর সময় নয়। দুর্যোধনকে যে কোনভাবে চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্যে মনকে শক্ত কর। হত্যা না করে তাকে ক্ষমা করলে সারাজীবন তোমাকে পস্তাতে হবে। সে কিন্তু তোমাদের রেহাই দেবে না। তার হাত থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি নেই। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-কন্দরে যেখানেই সে থাকুক, সর্বক্ষণ তোমাদের বিব্রত করবে। তোমাদের শান্তি কেড়ে নেবে। উদ্বেগ, দুর্ভাবনা নিয়ে তার পিছনে দৌড়তে হবে। তার চেয়ে, যে করে হোক তাকে খুঁজে বার কর এবং হত্যা কর। ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করে শত্রুকে হত্যা করলে কোন পাপ হয় না।

হঠাৎ-ই তাদের কথাবার্তার ভেতর ভীম এসে দাঁড়াল। কোন ভূমিকা না করে বলল: সখা কিছুক্ষণ আগেই ব্যাধ-গুপ্তচর সংবাদ দিল, গতকাল সন্ধ্যে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত দুর্যোধনকে

দ্বৈপায়ন হ্রদের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে তারা। আরো তিনজন তার সন্ধানে এসেছিল। দুর্যোধনের নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া পায়নি। নিজেদের ভেতর যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিল। ওরা বলাবলি করছিল, যুদ্ধের একটা পর্ব শেষ হলো। বাকী পর্বগুলি কোথা থেকে কি ভাবে শুরু হবে এবং শেষ হবে কে জানে? যুদ্ধ এখন কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যুদ্ধ হবে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। পাণ্ডবদের সঙ্গে ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণ মানুষের। শূদ্র বলে যারা ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, এদের সেনাপত্যের ভার নেবে অশ্বত্থামা।*

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বলল: দুর্যোধন কি করতে চায়, বুঝতে পেরেছ? এতো আর সাধারণ নরপতির জীবন নয়, কুরুপতি দুর্যোধনের জীবন, সুতরাং যে রাজ্যলাভের জন্যে তোমারা এত দুর্ভোগ এবং কষ্ট সহ্য করেছ, পুত্র অভিমন্যুকে হারিয়েছ, বহু লোকক্ষয় করেছ তা পেতে হলে দুর্যোধনকে হারাতেই হবে। তার নিধন ছাড়া সিংহাসন নিষ্কণ্টক হবে না। যুদ্ধের এটাই নিয়ম।

পূব আকাশ রোদে ঝলমল করছে। সকালের কুয়াশা নেই আর। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। উত্তরে অতিকায় মহিষের মতো কালো পাহাড়ের উপর সূর্যের আলো পড়ে গাছগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঝির ঝির বাতাসে গাছের শাখায় শাখায় পাতাগুলো উলোটি-পালোটি করছে। ঘুঘুরা ঘাসের বুকে দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। রোদ ঝলমলে সকালে চারদিকে অদ্ভুত মায়া তৈরী হয়েছে। আকাশে আকাশে, আলোয় আলোয়, বনে-প্রান্তরে সর্বত্র প্রাণের খুশি ছড়িয়ে পড়েছে।

পাঁচ ভাই, কৃষ্ণ আর কিছু সৈনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়া ছোটাল দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে। সকলের মনেই একটা চাপা

* মৎ-লিখিত "এবং অশ্বত্থামা" গ্রন্থটি অবশ্যই আপনাকে পড়তে অনুরোধ করব।

উত্তেজনা। কিন্তু প্রকাশ নেই কারো। কেবল বুকের মধ্যে সময় লাফাচ্ছে। প্রত্যেকের চোখে আক্রোশের আগুন জ্বলছে।

ঘোড়ার খুড়ের শব্দের ঢেউ তুলে বাতাস যেন পাহারাদারের মতো হাঁক দিয়ে গেল আগে আগে। পাহাড়, জঙ্গল ভরে গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। বড় একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে কৃপাচার্য কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা ঘুমোচ্ছিল। চোখ বোজা থাকলেও ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ ছিল। ঘুমের মধ্যেই ঐ আওয়াজ কানে এল। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল। প্রথমে কেমন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, দুর্যোধন কৌরব সৈন্য নিয়ে তাদের সন্ধানে বেরিয়েছে। উৎসুক চোখে ওরা তাকিয়েছিল শব্দটা যেদিক থেকে আসছে। দেবদারু গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে ওরা দেখছিল। দ্বৈপায়ন হ্রদের কাছে একটা ফাঁকা জায়গায় গোটা বাহিনীটা থমকে দাঁড়াল। ছ'জন লোক ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে খুব সন্তর্পণেই আসছিল। দূরত্ব কমে এলে মানুষগুলোকে তারা স্পষ্ট চিনল। যেটুকু নড়াচড়া তাদের ছিল, সেটুকুও আর থাকল না। গাছের গুঁড়ির এবং ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের সঙ্গে একেবারে মিশে থাকল। শিরা দপ্‌দপ্‌ করা প্রতীক্ষা নিয়ে তারা কি ঘটে দেখতে লাগল।

অশ্বত্থামা অবাক গলায় বলল: পঞ্চপাণ্ডব এবং কৃষ্ণ তো এদিকে আসছে। তবে কি দুর্যোধনের কোন সন্ধান পেল তারা?

কৃপাচার্য কথা বলল না। একটা কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে তার গন্ধ পেল যেন। অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল। ভয়ে নয়, উত্তেজনায় নয়, একধরনের চাপা, অপ্রকাশ্য অনুশোচনায় তার বুকটা টনটন করতে লাগল। অনুশোচনার শেষ ছিল না। তার উৎস আর শেষ যে কোথায় সে সম্পর্কে গভীর করে এই মুহূর্তে ভাবতে পারছিল না। মাথার মধ্যে এলোমেলো বিক্ষিপ্ত একরাশ ভাবনা তাকে শান্ত থাকতে দিচ্ছিল না।

দিগন্তজোড়া মুক্ত আকাশের নিচে কৃষ্ণকে দেখল। এ কৃষ্ণ নতুন, অচেনা, অনাবিস্কৃত। কৃষ্ণকে কোন কালে এত নিষ্ঠুর, নির্দয় হতে দেখেনি। দুর্যোধন সংহারে মরিয়া হয়ে কৃষ্ণ বাহিনী সাজাচ্ছিল। কে কোথায় কিভাবে দাঁড়াবে, গোটা চত্বরটা কিভাবে

ঘিরে ফেললে দুর্যোধন তাদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে পালাবে না তার নির্দ্দেশ দিয়ে পঞ্চপান্ডবদের সঙ্গে দ্বৈপায়ন হ্রদের জলাধারের দিকে এগোতে লাগল।

কৃষ্ণেরও যে বয়েস হয়েছে, আঠারোদিন ধরে যুদ্ধ করে সেও যে ক্লান্ত ; তার হাঁটা চলাতে একটুও মনে হচ্ছিল না। কৃষ্ণ হাঁটছিল না, মনে হচ্ছিল মাটির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। সকলের আগে আগে আসছিল আর পাণ্ডবেরা তাঁর অনুগমন করছিল।

কৃপাচার্যের এই প্রথম মনে হলো, কৃষ্ণ যেন দুর্যোধনের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছে। তার সব আক্রোশ দুর্যোধনের উপর। তবে কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা ছিল কৃষ্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের? পান্ডবদের পক্ষে কৃষ্ণ একা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তা-হলে এই মহাযুদ্ধ কি পান্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের নয়! কৃষ্ণও সঙ্গে দুর্যোধনের! তাই কি কৃষ্ণ এত মরিয়া? কৃষ্ণ শত্রুর শেষ রাখে না। দুর্যোধনকে পালিয়ে বাঁচতে দেবে না। মাটি খুঁড়ে বের করে আনলেও—আনবে তাকে। কৃষ্ণ সম্পর্কে বহুকালের বিশ্বাসের ঘরটা তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। কৃষ্ণের জন্যেই ভারতভূমি আজ শ্মশান হয়েছে। বোধহয়, শ্মশানের বুকে দাঁড়িয়েই মানুষ বড় কিছু অনুভব করতে পারে। নির্মোহভাবে প্রকৃত সত্য দেখতে পায়। কৃপাচার্যের হঠাৎ সেই সত্যদর্শন হলো।

কৃষ্ণের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এই মহাযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এর সূচনা ভার্গব গৃহে। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে সেখানে বসবাস করছিল। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে কৃষ্ণ বুঝেছিল সহায়হীন পাণ্ডবদের সহায়তায় হস্তিনাপুরে একটা গৃহবিবাদ বাধানো খুব সহজ। নির্বান্ধব পান্ডবেরা একটু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেই ধন্য হয়ে যাবে। তার টোপ ফেলতেই কৃষ্ণ-বলরাম এবং যাদবপ্রধানদের নিয়ে একেবারে ভার্গব কুটীরে হাজির হলো। পাণ্ডবদের দিয়ে কৃষ্ণ তার পথের কাঁটা সম্রাট জরাসন্ধকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার বুদ্ধি এঁটেছিল। এরপর পাকা খুনির মতো রাজবাড়ির এক নির্জন জায়গায় ডেকে এনে ভীমকে দিয়ে হত্যা করল তাকে। রাজসূয় যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্যলাভের ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রতিবাদ করায় জরাসন্ধের অনুগত

শিশুপালকে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের হাতে খুন করতেও তার হাত কাঁপেনি। তবু নিষ্ঠুর খুনি ভাবতে তাকে কষ্ট হয়েছিল। মানুষটার ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ মুগ্ধ করে রেখেছিল। কেবল সত্যদর্শী দুর্যোধন কৃষ্ণের মতলব আঁচ করতে পেরে তার হাতের অস্ত্র কেড়ে নেবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে পাণ্ডবদের উচ্ছেদ করতে কৃতসংকল্প হয়েছিল। পাণ্ডবেরা ছিল কৃষ্ণের টোপ। তার হাতের পুতুল। দক্ষ বাজিকরের মতো কৃষ্ণ যেভাবে আড়ালে থেকে নাচিয়েছে সেভাবে নেচেছে তারা। দুর্যোধন হাতের সেই পুতুলটিকে ভেঙে ফেলতেই পণ রেখে দ্যূতক্রীড়া করল। প্রতিপক্ষকে তার মুখ্য অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়ার আগেই সে অস্ত্র শুধু কেড়ে নিল না দুর্যোধন, তাকে একেবারে অকেজো করে দিল। দুর্যোধন চতুর ; কৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে যায়নি। কিংবা বিদ্বেষ বশে সংঘাত ডেকেও আনেনি। কৃষ্ণকেই ফাঁদে ফেলে তাকে মহাভারতের রণাঙ্গনে টেনে আনল। কৃষ্ণ নিরপেক্ষ নয়। সে নিজের স্বার্থেই পাণ্ডবদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। বিতাড়িত পাণ্ডবদের জেতানোর জন্যে মনের গোপন অন্ধকারে হিংসার ছুরিতে লুকিয়ে শান দিয়েছে। সেই চকচকে হিংসার উদ্যত ছুরি হাতে করে কৃষ্ণ সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দ্রুত পায়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকেই যাচ্ছে। রাগ হলো কৃপাচার্যের। আর ভিতরে ভিতরে উৎকণ্ঠা বাড়ছিল।

কৃপাচার্যের এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। কৃষ্ণকে বিশ্বাস করে তারা সত্যি ঠকেছে। বড় দেরী করে বুঝল। এমন একটা সময়ে তার মোহভঙ্গ হলো, যখন সত্যি কিছু করার নেই। দুর্যোধনকে সারাজীবন ধরে দোষারোপ করার জন্যে ভীষণ অনুশোচনা হতে লাগল। বারংবার মনে হলো, দুর্যোধনের বিপর্যয়ের জন্যে তারা অংশত দায়ী। এ দায় এড়িয়ে যেতে পারে না কোন মতে। অনুশোচনাটা পাথরের মতো ভারী হয়ে চেপে বসল বুকের উপর।

কৃপাচার্যের লম্বা নিঃশ্বাস পড়ল। আক্ষেপের নিঃশ্বাস। অশ্বত্থমার ভেতরটা চমকাল। বলল : মাতুল ! তোমাকে খুবই চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

কৃতবর্মা বলল : দর্পণ থাকলে দেখতে তোমাকেও বিধ্বস্ত লাগছে। শরীরে দোষ কি? অনেক ধকল সইতে হচ্ছে তো।

অশ্বত্থমা মুখ বিকৃত করল। বলল ঃ আসলে, প্রতিক্ষণ আমরা লড়ছি। শুধু আমরা কেন, প্রত্যেক মানুষের এক সত্তার সঙ্গে আর এক সত্তার বিবাদ, বিরোধ, প্রতিযোগিতা থাকে। সে অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চোখে দেখা যায় না। বোঝার ক্ষমতাও বাইরের সকলের থাকে না। তবে, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ হয় প্রত্যেক জীবের রক্তে আছে। মানুষের তো আছেই। দুর্যোধনের সঙ্গে কৃষ্ণের সেরকম নীরব এক অদৃশ্য লড়াই ছিল। আজ তা প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব সত্য। দুর্যোধন একথাটা কাউকে বোঝাতে পারেনি। কেউ মেনে নেয়নি। এটাই ছিল তার দুঃখ। কুরুবৃদ্ধেরা তার অহংকারকে দেখেছে, তার দূরদর্শিতাকে অনুভব করার চেষ্টা করেনি। মাতুল, তুমিও না।

কৃপাচার্য ভাগ্নে অশ্বত্থামার দিকে অপরাধীর মতো তাকাল। বলল ঃ জীবনে যা কিছুই হয় নিজের কৃতকর্মের ফল। এও এক উপলব্ধি। নিজেকে গভীর করে জানা বড় বুক ভাঙা অনুভূতি। এরকম অনুভূতি জীবনে যত কম হয় ততই ভালো। এখন ওসব কথা থাক। নিজেদের সমস্ত অস্তিত্ব গোপন করে প্রাণে বাঁচার কথা ভাব। আমরা যে এখানেই আছি, কৃষ্ণ কোনভাবে টের না পায় যেন।

কথাগুলো বলার সময় কৃপাচার্যের কণ্ঠস্বর গভীর বিষণ্নতায় ভিজে গেল। গভীর এক অনুশোচনায়, দুঃখে, ভয়ে, স্তব্ধ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে রইল।

অশ্বত্থামা একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল : এইভাবে লুকোনোর ভেতর কোন পৌরুষ নেই। এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তো মরতে পারি।

কৃপাচার্য ম্লান হাসল। বলল : মরার ভেতর কোন পৌরুষ নেই। বেঁচে থাকলে পৌরুষ দেখানোর অনেক সুযোগ পাবে। আজ যা কাপুরুষতা মনে হচ্ছে, কাল তাকে রণকৌশল মনে হবে। সময়ের সঙ্গে অর্থবোধও বদলে যায়।

কৃতবর্মা বলল ঃ আচার্য ঠিক বলেছেন। সংখ্যায় ওরা অনেক।

সামান্য অস্ত্র সম্বল করে এ'টে উঠতে পারব না ওদের। বরং হারাতে পারি ছলে এবং কৌশলে। তা প্রতীক্ষায় থাকাই ভালো। তা-ছাড়া দুর্যোধন জীবিত। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোন নির্দেশ নেই।

কৃপাচার্য অনুশোচনার গলায় বলল ঃ অনেক ভুল করেছি। এই ভণ্ড, মুখোশধারী মানুষগুলোর সঙ্গে কোন আপোষ নয় আর। একটা শেষ আঘাত হেনে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে যাব। শুধু সে-জন্যেই চুপ করে ঝোপের ভেতর মুখ গুঁজে শুয়ে থাক।

আর কোন কথা হলো না।

দুর্যোধনের উপর যে অভিযোগই থাক এই মুহূর্তে তার বিপদাশঙ্কায় কৃপাচার্যের বুকের ভেতরটা টনটন করতে লাগল। মুখে কথা না বললেও মস্তিষ্কের মধ্যে অবিরাম নিজের সঙ্গে কথা বলছিল। অনেক কথাই তার বুকে স্পন্দন তুলল। পাণ্ডবদের দূত হয়ে কৃষ্ণ কৌরবসভায় সন্ধির প্রস্তাব করতে এসেছে শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাড়াতাড়ি এক মন্ত্রণাসভা ডাকল। সে সভায় দুর্যোধন অসঙ্কোচে বলল ঃ এই যুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে কৃষ্ণ নিজেই তৃতীয় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার দুর্ভাবনা দুর্যোধন। দুর্যোধনের আধিপত্য বাড়তে দিতে চায় না কৃষ্ণ। রাজনৈতিকভাবে দুর্যোধনকে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজাই তার প্রতি সহানুভূতিশীল বলে কিছু করতে পারছে না। যে করে হোক সে আমাকে রাজ্যচ্যুত সিংহাসনচ্যুত করতেই পিতাকে মহাত্মা ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং কৃপকে বহুকাল ধরে বোঝানোর চেষ্টা করেছে ; আমার জেদ এবং একগুঁয়েমির জন্যেই যত অশান্তি। একাজে ধর্মের নামাবলি পরে পবম শ্রদ্ধেয় বিদুরজি সব সময় আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে সনাক্ত করে মুণ্ডপাত করেছেন। শ্রদ্ধেয় কুরুবৃদ্ধদের কাছে আমাকে হেয় করে পাণ্ডবদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতিশীল করেছেন। কেন? কাদের জন্যে? আমি এমন কিছু অন্যায় করিনি যে সবাই মিলে দল পাকিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করবে। এই মিথ্যেটা আমি ভেঙে ফেলতে চাই।

দুর্যোধনের রাগ দেখে বিদুর মিট মিট করে হাসছিল। তার রাগের আগুনে বাতাস দিতে বলল ঃ পাণ্ডবদের যেমন ঈর্ষা কর, কৃষ্ণকেও তেমনি ঈর্ষা করতে সুরু করেছ। তোমার নির্বুদ্ধিতায়

কুরুবংশ ধ্বংস হবে। এখনও শোধরানোর সময় আছে। শুধু তুমি রাজি হলেই মহারাজ পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইকে পাঁচখানি গ্রাম দিতে পারেন। তা হলেই এ যুদ্ধ হয় না। কৃষ্ণের এই ছোট্ট মিনতিটুকু তুমি মেনে নাও।

দুর্যোধন বিদুরের অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে হাসল। বলল ঃ কৃষ্ণ আমাকেই ঈর্ষা করে সে কথা কৃষ্ণের চেয়ে বেশি কেউ জানে না। আমাকে নির্মূল করাই তার উদ্দেশ্য। পাণ্ডবেরা না চাইলেও কৃষ্ণ দুর্যোধনকে উচ্ছেদ করার জন্যে কুরুবংশ ধ্বংস করবে। আমি তার সর্ব ভারতীয় নেতৃত্ব লাভের পথে কাঁটা। সেই কাঁটা, কাঁটা দিয়ে কি করে উপড়ে ফেলা যায় তার শলাপরামর্শ করতে কৃষ্ণ পান্ডবদের সঙ্গে বনে নিয়মিত মিলিত হতো। পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা তাদের সেই বৃহৎ পরিকল্পনারই একটা ছলনা। আমাকে বন্ধু রাজ্যগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত। কারণ কৃষ্ণের গ্রাম ভিক্ষার প্রস্তাব মেনে নেয়াটা এখন আমার একার ব্যাপার নয়। এক সঙ্গে বন্ধু রাজ্যগুলির মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। আমি যে একা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না এটা তুমিও জান ক্ষত্তা। তবু, তুমি এবং কৃষ্ণ বিড়াল তপস্বী সেজে আমাকে বিভ্রান্ত করছে।

বিদুর ভীষ্মর দিকে চেয়ে বলল ঃ পিতৃব্য আপনি কিছু বলবেন না?

পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনকে নিরস্ত করতে বলল ঃ দুর্যোধন, তুমি কৃষ্ণের কথা শোন। তাকে বিশ্বাস কর। যদি কৃষ্ণ তোমার উদ্বেগের কারণ হয়, সন্ধির শর্ত যদি ভঙ্গ হয় তা-হলে আমরা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

দুর্যোধন দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ঃ তা আর হওয়ার নয় পিতামহ। আপনার কথার উপর আস্থা রাখতে না পারার জন্যে আমারও আফশোষ হচ্ছে। আমরা এমন কি অন্যায় করেছি যে কৃষ্ণ পাঞ্চাল, পাণ্ডব এবং যাদব রাজ্যগুলি মিলে আমাকে হিংসা করছে। পিতামহ স্মরণ করুণ, আমাদের রাজ্য কেড়ে নেবার ভাবনা কৃষ্ণ করেছিল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা থেকে। তাতে আমি ভয় পেয়ে বলেছিলাম, কৃষ্ণ কৌরববংশের উপর আঘাত হানার মতলব এঁটেছে। হস্তিনাপুর থেকে আমাকে উচ্ছেদ করে ছাড়বে। ওদের

ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করবে। আমি আরও বলেছিলাম, যদি যুদ্ধ হয় তা-হলে আমাদের হার অনিবার্য। পিতামহ আমার দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠা দূর করতে আপনি বলেছিলেন —সাম্রাজ্যবাদী জরাসন্ধের জবরদস্তিতে অসহিষ্ণু ভারত রাজারা যুধিষ্ঠিরের প্রতি সহানুভূতিশীল। যুদ্ধ করলে হার অনিবার্য। প্রাণপণ করে যুদ্ধে মরতে পার, অথবা আত্মসমর্পণ করে অসম্মান নিয়ে বাঁচতে পার। রাজ্যই যদি খোয়াতে হয়, আপোষ করে মিটমাট করে নাও। আপনি কুরুরাজ্য ভেঙে দুটুকরো করে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু শান্তি স্থাপিত হলো কি? ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির সম্রাট জরাসন্ধকে হত্যা করে রাজসূয় যজ্ঞ করে পৃথিবীর অধিপতি হতে চাইল। কৃষ্ণের সুপরামর্শের যৌতুক স্বরূপ যুধিষ্ঠির তাকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য দিল। পাণ্ডবদের অভিসন্ধি কোনদিন ভালো ছিল না। পথের কাঁটা সরাতে পণ রেখে পাশা খেলতে বসল যুধিষ্ঠির। হেরে গিয়ে রাজ্য ছেড়ে বনে চলে গেল। এই হার যদি আমার হতো তা হলে কৃষ্ণ কি এভাবে আমার হয়ে রাজ্য ফিরে দেয়ার দৌত্য করতে আসতেন? কক্ষনো না?

কৃপাচার্য তাকে আশ্বস্ত করার জন্যেই বলল : অতীতকে ভুলে যাও। বর্তমান সংকটে কথা ভাব।

দুর্যোধন মৃদু হাস্যে অধর উন্মুক্ত করল। বলল ঃ অতীতের ঘটনা থেকেই মানুষ শিক্ষা নেয়। আচার্য কৃষ্ণের শত্রুতা, ক্রূরতা কেমন করে ভুলব? কৃষ্ণের প্রিয় পুত্র শাম্ব আমার কন্যা লক্ষ্মণাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ আমার প্রতি আক্রোশবশত সে বিয়ে হতে দেয়নি। বলরামের হস্তক্ষেপে বিয়ে হলো। এ হলো আমার প্রতি তার বিদ্বেষের দৃষ্টান্ত। আমার পরম আত্মীয় হয়েও হস্তিনাপুরে পাণ্ডব দূত কৃষ্ণ আমার আতিথেয়তাও আমন্ত্রণ দুই ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করল। আমার উপর তার আক্রোশ এবং শত্রুতা কোনভাবে আর গোপন নেই। আমার ধ্বংসেই তার সুখ।

আচার্য দ্রোণ বললেন ঃ উভয়ের হিতের জন্যে যুদ্ধ বন্ধ হলে তোমার তো ক্ষতি হবে না। সকলের কথা ভেবে তোমার রাজি হয়ে যাওয়া উচিত।

দুর্যোধন বেশ একটু থমকে গেল। বলল ঃ আচার্য, সন্ধি কোন চিরস্থায়ী সমাধান নয়। একটা সাময়িক চুক্তি মাত্র। সংকট কাটিয়ে উঠার একটা কৌশল। শত্রু দুর্বল থাকতে আক্রমণ করলে পরে পস্তাতে হয় না। সন্ধি করে তাকে অবস্থা সামলে উঠতে দিলে হিতের চেয়ে অহিত হয় বেশি, সেকথা বুঝিয়ে বলা কি খুব আবশ্যক। আচার্য, পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করবেই। তৈরী হওয়ার জন্যে একটু সময় নিচ্ছে। যুদ্ধ করে জিততে যে শক্তি দরকার যুধিষ্ঠিরের এখন তা নেই। লড়াই করে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না বলেই সন্ধি চাইছে। অতীতেও এরকম ছলনা করে তারা আমার মুখে কালি দিয়েছিল। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডের কথা আমি ভুলব কেমন করে? আমাকে সকলের চোখে খুনী আসামী সাজানোর জন্যে তারা নির্দয়ভাবে ছটি নিরীহ মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতেও কুণ্ঠিত হয় নি। এতবড় জঘন্য আমানবিক কাজ কারার জন্যে যাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র পাপবোধ নেই, তাদের মতো পাষণ্ডকে বিশ্বাস করে দ্বিতীয়বার ঠকার মতো নির্বুদ্ধিতা আর নেই।

দুর্যোধন যাই বলুক, ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু পুত্রের কথায় উৎসাহিত হলো না। শান্তভাবে সঞ্জয়কে খুব কাছে ডেকে এনে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ঠিক করে বলতো সঞ্জয়—দুর্যোধন যা বলছে সব সত্যি! তুমি তো পাণ্ডবদের সৈন্য সামন্ত সব দেখে এসেছ। ওদের সৈন্যবল, সামরিক ব্যবস্থা আমাদের থেকে ভালো, না খারাপ।

দুর্যোধন পিতার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আঁচ করতে পেরেই মরিয়া হয়ে বলল ঃ পিতা তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ। যুদ্ধ হয় নীতির প্রশ্নে। যে জিতল জয় হলো তার নীতির। ক্ষমতায়, শক্তিতে কে বড় আর কে ছোট ; যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে তার মীমাংসা হয়। একপক্ষকে হারতেই হয়। আমরা হারব, একথা ভাবছ কেন? বুদ্ধি বলো, শক্তি বলো, প্রতিভা বলো,—সব ব্যাপারে আমরা সমান সমান হলেও—জয়ের সম্ভাবনা দু'পক্ষেরই পঞ্চাশ ভাগ। পিতা শান্তির দূত কৃষ্ণকে বন্দি করলে কিন্তু আর কোন ঝামেলা থাকে না। ওই একটা মানুষের জন্য যত গণ্ডগোল। মূল বিরোধ কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে নয়, কৃষ্ণের সঙ্গে। পাণ্ডবদের মাঝখানে রেখে আমরা

পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বুদ্ধির কাজিয়া করছি। আমাদের দু'জনের একজন সরে না যাওয়া পর্যন্ত এই কাজিয়া থামবে না। তাই বলছি, কৃষ্ণ যাই বলুক, পাণ্ডবদের পাঁচখানি গ্রাম দিয়ে এই সমস্যার কোন সুরাহা হবে না। যুদ্ধ হবেই। কৌশলে কৃষ্ণ আমাদের রাজ্যের অভ্যন্তরে তার হারানো ঘাঁটিটাকে পুনরুদ্ধার করতে চাইছে।

দুর্যোধন শিশুর মতো অভিমান উন্মোচিত করে বিদায় নিল। কারণ, সে জানতো এটাই তার শেষ অস্ত্র। সকলের সব আপত্তি, দ্বিধা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে স্নেহান্ধ পিতার উপর রাগ অভিমান করেই সে তার জয় আদায় করে নিত।

পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণ একসঙ্গেই বলে ফেললেন, দুর্যোধন বড় অভিমানী বলেই রাগে দিশেহারা হয়ে অকপটে সত্যকথাটা বলে ফেলল। এই মন নিয়ে শান্তির চুক্তি করা কঠিন। তার কথাগুলো মিথ্যে নয়। এ হলো দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার বংশ-লতার পুরনো বিবাদ।

সভায় কৃষ্ণ যেদিন সবার সামনে দুর্যোধনকে অভিযুক্ত করে শান্তির প্রস্তাব দিল, তখন দুর্যোধনের মুখে চোখে বিরক্তি, ঘৃণা ক্রোধ হতাশার ভাব ফুটে উঠল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ কৃষ্ণ, তুমি আমার আত্মীয় এবং রাজ অতিথি। তুমি আমার অভ্যর্থনা এবং আমন্ত্রণ কিছুই গ্রহণ করনি। অভদ্র ব্যবহার করেছ। বিদুরের বাড়ীতে থেকে রাজ-আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করেছ। তোমার আচরণও বৈরীর মতো। ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা কিছুই গোপন করনি। তবু নিয়মমাফিক শান্তির প্রস্তাব করতে এসেছ। এই ভণ্ডামির কোন প্রয়োজন ছিল কি? পাণ্ডবেরা যুদ্ধ চায় না, কিন্তু তুমি চাও। তাই সশস্ত্র বিশাল বাহিনী এনেছ সঙ্গে। বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ সৃষ্টি করে শান্তির প্রচেষ্টাকে পরোক্ষভাবে বানচাল করলে। শোন কৃষ্ণ, তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। আমরা যুদ্ধ করব। পিতা পাণ্ডবদের যতটুকু রাজ্যাংশ দেবেন বলেছিলেন, আমি বেঁচে থাকতে সেটা আর পাবে না। যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন পাণ্ডব-দের সূচগ্র ভূমিও দেব না। এটাই আমার শেষ কথা।

দুর্যোধনের দম্ভের কথা শুনে কৃষ্ণ ম্লান হাসল। উদাস গলায়

বলল ঃ গর্ব করে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু কার অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে? আমার অবস্থায় না পড়লে তুমি কখনোই আমার সমস্যার কথা বুঝতে পারবে না।

দুর্যোধন রাগত গলায় বলল ঃ কৃষ্ণ তুমি নিজে একটা জালের মধ্যে বাস কর। সেই জালে আমি ছাড়া সকলে আটকা পড়েছে। তোমার সমস্যাও একটা। পৃথিবীর অধিপতি হওয়ার পথে বাধা আমি। দুর্ভাগ্যের কথা, আমি বেঁচে থাকতে পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার সাধ, স্বপ্ন কোনোটাই পূরণ হবে না তোমার। কারণ বহু কিছুর জন্যে দায়ী তুমি। আমার চেয়েও তুমি ক্ষমতালোভী, অহংকারী এবং নির্দয়। আমার থেকে বেশি একথা কেউ জানে না। আমাকে পথের কাঁটা মনে করে সরাতে চাও। অথচ, আমি মিত্র ও আত্মীয় হওয়ার জন্যে তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে ধরলাম, কিন্তু তুমি হাত গুটিয়ে নিলে। শত্রুর সঙ্গে করমর্দন যখন করা যায় না, তখন সন্ধি হবে কি উপায়ে? কৃষ্ণ, তুমি বেঁচে থাকতে কৌরব-পাণ্ডবদের বিবাদের নিষ্পত্তি হবে না। তুমিই হতে দেবে না। তোমার মতলব আজ ফাঁস হয়ে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কৃষ্ণ একটুও রাগল না। বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণায় ভুরু কুঞ্চিত হলো না। বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল না। খুব শান্ত হয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। হাসল, উপেক্ষার হাসি।

দুর্যোধনের দৃপ্ত ভাষণের চৌম্বিক আকর্ষণ সভাশুদ্ধ লোককে এক অবাক মুগ্ধতায় সম্মোহিত করে রেখেছিল কিছুক্ষণ। তারা কৃষ্ণকে দেখছিল না, দুর্যোধনকেই দেখছিল শুধু। এই মানুষটা বিদ্রোহী। কিন্তু তার বিদ্রোহের রকমটা এরকম বিদঘুটে কেন? কয়েকটা মুহূর্তের বিভ্রম। যেন এক স্বপ্নদৃশ্য। কৃষ্ণের প্রতি অবিশ্বাসে, সন্দেহে বুকটা সকলের কেমন করছিল। সেই অবোধ রহস্যময় অনুভূতির আকস্মিক আচ্ছন্নতার ঘোর কাটলে কৃষ্ণকে তার জায়গায় কেউ দেখতে পেল না।

কৃপাচার্য স্বচক্ষে এসব ঘটনা ঘটতে দেখেছে। কৃষ্ণকে এত গভীর করে, নির্মোহভাবে দুর্যোধনের মতো কেউ দেখেনি। তার সন্ধানী মনের আলো পড়ে এক অন্য ভয়ঙ্কর কৃষ্ণকে সেদিন কৌরবসভায় দেখেছিল সকলে। চিরকালের চেনা কৃষ্ণের রূপটাই তাতে বদলে

গেল। বহুদিনের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, অনুরাগ নিয়ে গড়ে ওঠা কৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যবোধগুলি দুর্যোধনের অকপট ভাষণের ধাক্কায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার সাম্রাজ্যলোভ, বিশ্বের অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন ও বাসনা এত বড় ও অভিনব যে পৃথিবীর মানুষের ভাবনা-চিন্তার মধ্যে তাকে আঁটে না। এক চতুর ছলনার জালের মধ্যে বাস করছিল বলে কেউ তার মনের গতি-প্রকৃতি দেখতে পায়নি। জাল অপসারিত হলে কৃষ্ণের বিশ্বগ্রাসী রূপটা বেরিয়ে পড়ল। এক অচেনা, অন্য কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর রূপে আত্ম-প্রকাশ করল। সেই সময়ের অনুভূতির কথা মনে আছে কৃপ'র।

শরীর মন চমকে উঠল সবার। কৃষ্ণের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল মহাকাল কৃষ্ণের মূর্তি ধরে যেন তাদের গ্রাস করতে আসছে। কৌরব-পাণ্ডবের রণডঙ্কা যেন মহাকালের পায়ে নূপুর হয়ে বাজছে। সবাই কেমন বিভোর হয়ে পড়ছে। মিটমাটের শেষ সম্ভানাটুকুও আর থাকল না। নটরাজ নাচছেন। তাঁর এক পা অতীতে আর এক পা বর্তমানে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব অনুভূতি, উপলব্ধি, ভাবনা এবং ঘটনার তরঙ্গ দোলায় দুলছে শরীর, মন, চেতনা। চোখ আছে কিন্তু দৃষ্টি নেই। এক অদ্ভুত বিহ্বল অবস্থার ভেতর শুনতে পেল ভীষ্মের কণ্ঠস্বর। স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় ভীষ্ম বলছিল ঃ নটরাজ, তোমার নৃত্য থামাও। আমার বুকের হাড় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা। তুমি পা মুড়ে যোগীরাজ হয়ে যাও। নীলকণ্ঠ হয়ে পৃথিবীর সব বিষ শুষে নাও।

মাটি থেকে একটা পোকা কৃপের গায়ে উঠল। সুড়সুড়িতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। কৃপাচার্যের সমস্ত অনুভূতি মুহূর্তে জেগে উঠল। চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। বিদ্যুৎগতিতে হাতটা পিঠের দিকে ছুটে গেল। পোকাটাকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। তারপর কিছু না দেখেই নির্দয়ভাবে মাটিতে পিঁষতে লাগল। তার হাতের চাপে মড় মড় করে ভাঙতে লাগল তার দেহের খাঁচা। রেণু রেণু হয়ে গেল মাটিতে।

ধুলোমাখা বুড়ো আঙুলের দিকে চেয়ে ফিস ফিস করে বলল : ভাগ্নে, পৃথিবীর সব প্রাণীই এভাবে তার শত্রু এবং বিরক্ত উৎপাদনকারী শক্তিকে নিঃশেষ করে। কৃষ্ণ ও দুর্যোধনকে তাই

করতে চাইছে। শান্তিতে বেঁচে থাকার এটাই বোধ হয় নিয়ম। নিজের শান্তি, সুখ নিরাপত্তা কেউ যদি বিঘ্ন করে তাকে ক্ষমা না করাই জীবনের ধর্ম।

অশ্বত্থামা বেশ একটু বিরক্ত হয়ে ডাকল ঃ মাতুল। ভাবাবেগ মানুষকে দুর্বল করে, আবার উদ্দীপ্তও করে। এখন জ্বলে উঠার সময়। নিজেদের খুশির জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে আমাদের এখন প্রতীক্ষা করতে হবে।

কৃপাচার্য উত্তর দিল না। নিজের মনেই আফশোষ করে বলল : মানুষের ভাগ্য কি বিচিত্র! কী অদ্ভূত তার পরিণতি। তবু মানুষ এই নিয়ে আস্ফালন করে। একাদশ অক্ষৌহিণীর সেনানায়ক কুরুকুলপতি দুর্যোধন ভুলেও এরকম একটা অবস্থার কথা ভাবেনি। যে মানুষ মরতে ভয় পায় না, আশা পূরণের জন্যে, প্রাণে বেঁচে থাকার জন্যে সে মানুষকে পালিয়ে জীবনরক্ষা করতে হয়।

কৃপাচার্য হঠাৎ-ই নিজেকে প্রশ্ন করল ঃ কেন? এর জন্য দায়ী কে? এরকম অদ্ভুত জিজ্ঞাসায় মনে দার্শনিক ভাব জন্মে। পৃথিবীতে সবাই নিজের মতো থাকতে চায়। চাইলেই কি পাওয়া যায়! এক একজনের চিন্তাভাবনা এক এক স্তরে চলে। তাই একে অন্যকে বুঝতে চেষ্টা করে না। প্রত্যেকে নিজের নিজের জায়গায় স্বাধীন। নিজের সুখের জন্যে, খুশির জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে বিপক্ষকে সহ্য করতে না পারার পেছনেও কারণ থাকে। তার কিছু বলার থাকে; কিন্তু সেই প্রশ্নটাই করে না কেউ। দুর্যোধনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সে ভীতু নয়, দুর্বলও নয়। কাপুরুষ তো নয়ই। রূপ-রস, শব্দ, গন্ধভরা পৃথিবীকে সেও ভালবাসে ভীষণ। জীবনের সঙ্গে তার কোন কপটতা নেই। তাই, যারা ভদ্র, মিথ্যাচারী, প্রতারক তাদের বিরুদ্ধে একা লড়তে ভয় পায়নি। এটাই তার বড় অপরাধ। এই মূল্যবোধের জন্যে আজ অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে তাকে। কৃষ্ণের কপটতার কারণেই এই দাম দিতে হলো। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা থেকে তার সূচনা। কৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আসা সেই প্রথম। বিদ্বেষ বিভেদের চারগাছটি সকলের অলক্ষ্যে কৌরবভূমিতে কৃষ্ণ রোপণ করে গেল। একা দুর্যোধনই তা লক্ষ্য করেছিল। তার চোখে ফাঁকি দিতে না পারার

জন্যে একটা তীব্র আক্রোশ ছিল তার উপর। পুরনো সে কথা মনে হলে কৃষ্ণের উপর রাগ হয় কৃপাচার্যের। প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে যুধিষ্ঠির কিছু করেনি। সে কৃষ্ণের নির্দেশ মেনে চলার যন্ত্র শুধু নয়, মারাত্মক অস্ত্রও বটে। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্যে যা কিছু করেছে, নিজের জন্যেই করেছে। কৃষ্ণের নির্দোষ ভাবমূর্তির পেছনে পাণ্ডবদের অনেক অন্যায়, পাপ এবং অধর্ম রয়েছে। কৃষ্ণের জন্যে অনেক অপ্রিয় কাজ পাণ্ডবেরা করেছে, কিন্তু তার কলঙ্ক কৃষ্ণের গায়ে লাগেনি। তার মহিমা অমলিন রয়ে গেছে। পাণ্ডবেরা যে তা বোঝেনি এমন নয়, কিন্তু অস্ত্রের তো কোন ইচ্ছে, স্বাধীনতা থাকে না। অস্ত্রীর হাতে ক্রীড়নক সে। কৃষ্ণ তাই পাণ্ডবদের যেমন খুশি ব্যবহার করেছে। কৃষ্ণ তার শেষ এবং একমাত্র শত্রু দুর্যোধনকে তাই পালিয়ে বাঁচতে দেবে না। যেখানে আত্মগোপন করুক কৃষ্ণ তাকে খুঁজে বার করবেই।

সংকটে পড়লেই মানুষ গভীর করে অনুভব করে। নতুন করে আবিষ্কার করে নিজেকে। তার পুরনো ধারণাগুলো হঠাৎ-ই এক নতুন মাত্রা পায়। সে নিজেও এক অন্য মানুষ হয়ে যায়।

পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণ যেরকম মারমুখী হয়ে আসছে তাতে কৃষ্ণ সম্পর্কে কৃপাচার্যের এতকালের বিশ্বাসগুলি তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। পাণ্ডবেরা নয় কৃষ্ণই তাদের চেয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল। পঞ্চ পাণ্ডবেরা তার সঙ্গে যেন কিছুতে পা মিলিয়ে উঠতে পারছিল না। কষ্টে ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল তাদের। কিন্তু কৃষ্ণের শ্রমজনিত কোন কষ্ট ছিল না। দুর্যোধনকে সকলের আগে খুঁজে বার করার কৃতিত্বটা যেন সে একাই পেতে চাইছে। কৃপাচার্যের হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। কৃষ্ণ চিরজীবন একটা মাত্র প্রেমে মজে আছে। সে প্রেমের নাম আত্মপ্রেম। আত্মপ্রেম মানুষকে বড় স্বার্থপর আর আর নির্দয় করে। কৃষ্ণ রাজনীতিতে একাধিপত্য স্থাপন ছাড়া আর কিছু ভালোবাসেনি। কৌশল ছাড়া অন্য কিছু শ্রদ্ধা করেনি, স্বীকারও করেনি। শত্রুর সঙ্গে কোন আপোষ করেনি, হত্যা করে নির্মূল করেছে। শেষ শত্রু দুর্যোধন।

কৃষ্ণ লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল লাল ধুলো আর নুড়িভরা

পথে। পাহাড়ী রাস্তা এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নিচু। এগোতে এগোতে যেমন দরকার তেমন তেমনই পথ বদলে ওরা দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে এগোতে লাগল। দূরত্ব রক্ষা করে ওদের পিছন পিছন সৈন্যেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দ্বৈপায়নের দিকে অগ্রসর হলো।

রাগে কৃপাচার্যের দু'চোখ দপ করে জ্বলে উঠল। ইচ্ছে করল অলক্ষ্যে থেকে কৃষ্ণের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দেয়। কিন্তু নীতিহীন ক্ষাত্রযুদ্ধ করতে তার হাত উঠল না। একজন গুপ্তঘাতকের সঙ্গে তাহলে তার পার্থক্য কোথায়? চিরদিন গুরুগিরি করে এসেছে। যুদ্ধনীতি মেনে শিষ্যদের যুদ্ধ করতে শিখিয়েছে। এখন সে নীতি লঙ্ঘন করলে শিক্ষার কোন মানেই থাকে না। কৃষ্ণের মতো একজন কূট কৌশলী যোদ্ধা এবং রাজ-নীতিকের যা শোভা পায়, একজন আচার্যকে তা মানায় না। শিক্ষার জন্যে আদর্শের জন্যে আচার্যেরা ইচ্ছেমতো অনেক কিছুই পারে না করতে। এই অতৃপ্তিতে তার ভেতরটা রি-রি করে জ্বালা করতে লাগল।

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল দুর্যোধনের।

সূর্যের আলো তির্যকভাবে সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়েছে। ঘন কালো অনেক ফিকে এখন। গুপ্ত কক্ষের দ্বার এবং গৃহের ভেতর স্পষ্ট দেখা না গেলেও চিনে নিতে কষ্ট হয় না। পাথরের দেয়ালে গায়ে হাত রেখে দুর্যোধন সন্তর্পণে নামতে লাগল। কক্ষে ঢুকল। শ্বেত পাথরের বেদীর উপর ধুলো জমে পুরু হয়ে আছে। ফুঁ দিয়ে বেদী পরিষ্কার করে বসল।

স্বস্তির শ্বাস পড়ল। একটানা উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ আর শ্রমের পরে নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় লাভের ভেতর যে এত সুখ ও আরাম আছে—এই অনুভূতি দুর্যোধনের প্রথম। মনে হলো, তার ভয় নেই। কেমন একটা অদ্ভূত নিরাপত্তা আর নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চয়তার প্রশান্তিতে তার ভেতরটা ভরে যেতে লাগল।

এই প্রথম তীব্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করল। লম্বা দালানের একধার ঘেঁষে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে ঝর্ণার জল। আঁচলা করে

প্রাণ ভরে জল পান করল দুর্যোধন। আরামে চোখ জুড়িয়ে গেল। বেদীর উপর লম্বা হয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে রইল চুপ করে।

অতঃ কিম!

প্রশ্নটা দুর্যোধন নিজেকেই করল। কিন্তু চট্ করে সে তার জবাব দিতে পারল না। লম্বা শ্বাসের সঙ্গে অসহায়ভাবে উচ্চারণ করল—আপোষ করব? কার সঙ্গে, কিসের আপোষ করবে? নিজের মতো হতে চাওয়া অপরাধ কী? জীবনের অনেক দাবীর মধ্যে নিজের মতো থাকতে চাওয়া একটা দাবী মাত্র। জীবনের আকাশে পাখি হয়ে বেড়াতে যদি না পারল, তা'হলে বেঁচে থেকে লাভ কি? মানুষ হয়ে মরার আগে বাধার শিকড়টাকে বুনো মহিষের মতো শিং দিয়ে উপড়ে ফেলে স্বদেশের স্বরাজ্যের মাটির গন্ধ যদি নাক ভরে নিতে না পারল তা-হলে মানুষ হয়ে জন্মানোই বৃথা। সে আর অনুকম্পা চায় না, অনুগ্রহ, সমবেদনা চায় না কারো কাছে। এসব নিয়ে নিজেকে ছোটও করবে না আর। নিজে নিজের মতো না হয়ে উঠতে পারলে তার মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। সে থাকা, না থাকা সমান।

সহসা বুকের গভীর থেকে একটা লম্বা শ্বাস পড়ল। হাহা-কারের মতো ঘরময় ছড়িয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে শ্বাসের শব্দটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে লেগে রইল। থমধরা বিপন্ন বিষণ্ণতা নিয়ে নিরুচ্চারে বলল: শুধু নিজের জোরে বাঁচতে গেলে তাতে দাগই ধরে যায়। কলঙ্ক কেবল বাড়ে। জিভও সামান্য বেকায়দায় পড়লে দাঁত কামড়ে দিয়ে বে-ইজ্জত করতে কসুর করে না। আশ্চর্য! মানুষের নিজের অঙ্গই নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। অদৃষ্ট তো করবেই! এভাবে নির্জনে নিজের মতো করে দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে বেশ লাগছিল।

সংসারে যার জীবনের যাত্রাপথ বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে হলো তার শেষ পরিণতি যে কোথায় কেমন করে কোন চোরাবালিতে গিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানবে তা সৃষ্টিকর্তাও বোধহয় বলতে পারবে না। সৃষ্টিকর্তা তাকে তো একজন সাধারণ মানুষ করে সৃষ্টি করেনি। নয়া ভারতের ইতিহাস সৃষ্টির এক মহানায়ক করে গড়েছে। যাকে সেই ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয় তার জীবন সরলরেখার মতো হয়

না। কাজ-কর্মে, কথা-বার্তায়, আচরণে তাকে কখনো সহজ বা রূঢ় হতে হয়, আবার কখনও বা মধুর বা নিষ্ঠুরও হতে হয়। কারো মনোরঞ্জন করার দায় তার নেই, আবার কারো মুখ চাওয়ার দায়িত্ব নিলেও তার চলে না। কর্তব্যে নিরপেক্ষ এবং নিষ্ঠুর হতে হয়। নিজের মতো চলতে তাকেও অনেক সময় নিষ্ঠুর ও রূঢ় হতে হয়েছে।

মনে আছে, যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরে যুদ্ধের কর্মপন্থা স্থির করা নিয়ে রুদ্ধদ্বার মন্ত্রণাকক্ষে এক বৈঠক বসল। সকলে তখনও এসে পৌঁছয়নি। কক্ষে একা সে। উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘরময় পায়চারি করছিল। অশান্ত মনটা কিছুতে তাকে বর্তমানের মধ্যে স্থির থাকতে দিল না। সময়ের উজানে অতীতের তরীতে চেপে এক সুদূর অতীতলোকের মধ্যে ভ্রমণ করতে লাগল।

কুরুক্ষেত্রের আসন্ন যুদ্ধটা কার্যত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের সংঘাত। এই সংঘাতের বীজ এই পরিবারের অভ্যন্তরেই নিহিত। যযাতি থেকে তার শুরু।

ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীকে বিয়ে কয়ে যযাতি ব্রাহ্মণশ্রেণীর সঙ্গে একটা আপোষ করে ক্ষত্রিয়দের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর নীতি নিয়েছিল। ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণদের দেব-অর্চনা, বিদ্যাচর্চা, বিবিধ সামাজিক মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মে তাদের পৌরহিত্য এবং জনহিতকর কার্যে তাদের গৌরবময় ভূমিকা, ত্যাগ, তিতীক্ষা সর্বস্তরের মানুষের অন্তরে একধরণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। ক্ষাত্রবলে জনমন থেকে কোনদিন তা মুছে দেবার নয়। তাই যযাতি ব্রাহ্মণ্য-শক্তির সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে না গিয়ে কৌশলে তাদের দূরে ঠেলে দেবার এক চতুর নীতি নিয়েছিল। শুক্রাচার্য কন্যা দেবযানী যিনি মহারাণী এবং ব্রাহ্মণও বটে, তার অন্তরঙ্গ বান্ধবী অসুর রাজকন্যা শর্মিষ্ঠাকে রাণীর মর্যাদা দিয়ে যযাতি দুই বান্ধবীর ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও রেষারেষি সৃষ্টি করে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের কালহরণ করছিল।

বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রক্তের উত্তরাধিকারকে যযাতি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে ক্ষাত্র-প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু সে পথের অন্তরায় ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানীর জ্যেষ্ঠপুত্র যদু। ন্যায়ত,

ধর্মত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সেই। কিন্তু তাকে রাজা করলে ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তাই যযাতি আমৃত্যু রাজ্য শাসনের তৃষ্ণা নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল ক্ষাত্রশাসন প্রতিষ্ঠার। শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্রের হাতে সিংহাসনের ভার অর্পণ করে যযাতি যেদিন রাজ্য-পরিচালনা থেকে অবসর নিল, সেদিন ব্রাহ্মণেরাই প্রতিবাদ করল প্রথম। বলল ঃ মহারাজ, আপনি শুক্রা-চার্যের নাতি এবং দেবযানীর গর্ভে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে শর্মিষ্ঠার ছেলে পুরুকে রাজা করলেন কি করে? যদুর শরীরে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে বলে কি এই কপটতা করলেন তার সঙ্গে? দেবযানীর পুত্রদের প্রতি অধর্ম করার মূল্য পরবর্তীকালে এই রাজবংশকেই দিতে হবে। আপনার পাপের ফলভোগ করবে পরবর্তী নির্দোষ প্রজন্ম।

প্রত্যুত্তরে যযাতি বলল ঃ মহাত্মন! আপনাদের অভিযোগ অসত্য। পক্ষপাতদুষ্ট। আমি কোন অধর্ম করিনি। পিতার কাছে সব সন্তানই সমান। তাদের বঞ্চিত করার কোন প্রশ্নই নেই। বৃদ্ধ বয়সেও ক্ষমতার তপ্তস্বাদ ছেড়ে আমি বাণপ্রস্থে যেতে পারিনি। ক্ষমতার উত্তাপে আমার অন্তরে ঘুমন্ত আকাঙ্খাগুলো জেগে ওঠে। আরো রাজ্য চাই, ঐশ্বর্য চাই—পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে এ পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, আনন্দের, তৃপ্তির, সুখের, উল্লাসের, উত্তেজনার তার তলানি পর্যন্ত ভোগ করব। তখন বুঝিনি, প্রদীপের আলো যখন কমে আসে, সে দপ্ দপ্ করে বেশি তেজে জ্বলতে চায়; নতুন তেল না পেলে যে আর জ্বলবে না এ জ্ঞান তার থাকে না। ক্ষমতার নেশা যে রূপসী রমণীর কাঞ্চন যৌবনের মতো নেশাপ্রদ জানতাম না। সারাজীবন তার মাদকতা বয়ে বেড়ানের আনন্দ এবং সুখের শেষ কোথায় নিজের জীবন দিয়ে জানার দুর্বার ইচ্ছাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করতে শুধু বিলম্ব হলো। কিন্তু এত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য ধরতে পারল না দেবযানীর পুত্রেরা। শর্মিষ্ঠার দুই পুত্রও হতাশ হয়ে রাজ্যের আশা ত্যাগ করে দেবযানীর পুত্রদের মতো নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে আমাকে ত্যাগ করল। ভাগ্যই টেনে নিয়ে গেল তাদের। নইলে, এ রাজ্য তো যদু'র হতো। তার অবর্তমানে শর্মিষ্ঠার

জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যুর হতে পারতো। নিজের কর্মফলে তার রাজ্যের উত্তরাধিকারী পেল না বলে আমাকে দোষারোপ করা কেন? তাদের সঙ্গে কোন অধর্ম করিনি। বরং, বৃদ্ধ পিতাকে দেখা শোনার কোন দায়িত্ব তারা নিল না। পুত্রের কর্তব্য তারা করল না। তাহলে অপরাধী কে? কনিষ্ঠ পুত্র পুরু জরাগ্রস্ত পিতার প্রতি কর্তব্য করার জন্যে নিজের সুখ, আনন্দ বিসর্জন দিয়ে আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দকে বড় করে দেখল। তার সেবা যত্নে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এখন ক্ষমতায় বিতৃষ্ণা জন্মেছে, ভোগে বীতস্পৃহা এসেছে। অন্য পুত্রেরা যে যার মতো সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। কেবল পুরুই কিছু করেনি আমার জন্যে। তাই এ রাজ্যের অধীশ্বর করলাম তাকে। এর ভেতর আমার অন্যায় কোথায়?

তবু দেবযানীর পক্ষ নিয়ে শুক্রাচার্যের এক শিষ্য বলল: মহারাজ, শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে আপনি কোনদিন ভালোবাসেননি। অভিশাপের ভয়ে, তাকে শুধু জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন। তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছেন। আপনার প্রকৃত প্রেম, ভালবাসা, মমতা ছিল অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে। মনে মনে আপনি তার পুত্রকেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই ক্ষমতার মোহে আঁকড়ে থেকেছেন সিংহাসন। পাছে লোকের চোখে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়ে তাই শর্মিষ্ঠার দুই পুত্রকেও নির্বাসন দিলেন।

যযাতি ব্রাহ্মণপুত্রের অভিযোগে শুধু হাসল। মৃদু কণ্ঠে সবিনয়ে বলল: শর্মিষ্ঠার দুই পুত্রকে নির্বাসনে পাঠানোর অর্থ যে বিকৃত হতে পারে জানা ছিল না। দেবযানীর পুত্রেরা স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করেছিল বলে এই নির্বাসনকে তার সঙ্গে যুক্ত করার কোন কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। দেবযানীর পুত্রদের শরীরে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে বলে তারা সহজেই যে দাবি এবং অধিকার ত্যাগ করতে পারল শর্মিষ্ঠার ছেলেরা তা পারল না। তাদের শরীরে ক্ষাত্ররক্ত থাকার জন্যেই হয়তো পিতার বিরুদ্ধাচরণ করার পথ বেছে নিল। শর্মিষ্ঠার পুত্র বলে তারা রাজদ্রোহের ক্ষমা পায়নি। আমার ন্যায় বিচারকে হেয় করে দেখার চেষ্টা করলে তার গৌরব কিছুমাত্র কমবে না। আপনাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ

ভিত্তিহীন। নিরর্থক।

শুক্রাচার্যের শিষ্যটি সরোষে বলল : পবিত্র সূর্যবংশে অসুর রক্ত ঢুকল। পুরুর রূপ ধরে পাপ প্রবেশ করল। একদিন এর মূল্য দিতে হবে পরবর্তী প্রজন্মে। সেদিন দোষ শোধরানোর কোন উপায় থাকবে না।

যযাতি একটু বিরক্ত হয়েই বলল : অসুর রক্ত কাকে বলে? ব্রাহ্মণের নিরঙ্কুশ অধিকারের গায়ে আঁচড় লাগলেই সে অসুর হয়ে যায়, রাজ্যে পাপ ঢোকে— এ কেমন যুক্তি? চন্দ্রবংশধারায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় রক্ত ঢুকল বলে ব্রাহ্মণদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পুরুর সন্তান-সন্ততির মধ্যে দিয়ে এক বিশাল ভারতবর্ষের জন্ম হবে। ব্রাহ্মণের কোন গাল-মন্দে তা থমকে থাকবে না। কাল নিজের পথেই তাকে টেনে নিয়ে যাবে। পুরুর মধ্যে দিয়ে আসল বংশের ধারাটি অক্ষুণ্ণ থাকল।

যযাতির অন্য পুত্রেরাও ভারতের ভূখণ্ডে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফল হলো। যদু চর্মন্বতী, বেত্রবতী এবং শুক্তিমতী নদী বিধৌত অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করল। তার নাম থেকেই সৃষ্টি হলো যদুবংশ। দেবযানীর দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসুর রাজ্য ছিল যবনদেশে। তার থেকে উদ্ভব হলো যবনবংশ। শর্মিষ্ঠার নির্বাসিত পুত্র অণু থেকে উৎপত্তি হলো ম্লেচ্ছরা। তার অন্য পুত্র দ্রুহ্যু রাজ্য স্থাপন করল যমুনার পশ্চিম পার বরাবর। দ্রুহ্যুর ছেলে ভোজ থেকে উদ্ভব হলো ভোজবংশ। যমুনার পশ্চিম পার পর্যন্ত যাদব আর ভোজেরা রাজত্ব করত। কিন্তু জ্ঞাতি শত্রুতা থাকার জন্যে তাদের ভেতর রেষারেষি এবং সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। পুরু ছিল যযাতির স্বীকৃতি দেয়া আসল রাজা। যযাতির রাজ্য 'প্রতিষ্ঠান' ভূখণ্ডে সে রাজত্ব করতে লাগল। কৌরব বংশের আসল ধারাটি পুরু থেকেই শুরু হলো।

হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠাতা হস্তী ও পুরু বংশের রক্তধারা বহন করছে। তাঁর পুত্র কুরু সিন্ধু নদ থেকে গঙ্গার পশ্চিম পার পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলেন, এবং তাঁর নামানুসারে কৌরব নামে এক স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন কীর্তির স্বাক্ষর রাখলেন।

বংশমূল খুঁজতে গিয়ে দুর্যোধন বেশ ধাঁধায় পড়ল। মহারাজ পুরু থেকে ভরত পর্যন্ত প্রায় দশ পুরুষের ব্যবধান। এর পরেও পৌরব, কৌরব এবং যাদবদের রক্তে আরও কতরকমের রক্তধারা মিশেছে। অসুরের রক্ত, মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণের রক্ত, বেশ্যার রক্ত, দেবতার রক্ত সবই নির্বিকারভাবে মিশেছে এবং বিবিধ ধারা, উপধারায় বিভক্ত হয়ে বটবৃক্ষের ডালপালার মতো শিকড়ের মতো চারিয়ে গেছে গোটা ভারতভূমিতে। বংশপঞ্জীর বিচারে কৌরব-পাণ্ডবের বিবাদ, বিভেদের মূলে আছে এই রক্তবন্ধন। এই রক্ত বন্ধনের সূত্রেই কৌরব-পাণ্ডবের রাষ্ট্রজোট। দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার অংশে যে দুটি বংশধারার বিকাশ তাদের মধ্যে নিত্য-বিরোধ লেগে ছিল। বিরোধটা মূলত একই পরিবারের জ্ঞাতি গোষ্ঠী এবং ভাইর মধ্যে। সেই পুরনো সংঘর্ষই কৌরব পাণ্ডবের সংঘর্ষের রূপ ধরে প্রকাশ পেল। আসল বিবাদটা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মের। পাণ্ডব এবং কৌরব তার দুটি পক্ষ।

চিন্তার মধ্যে একটা অভিনবত্বের আলোকপাত হয়। চমক লাগে। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই দ্বারীরা পিতামহ ভীষ্ম, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, আচার্য দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, মাতুল শকুনির আগমন বার্তা ঘোষণা করল। দুর্যোধনের বুকে কিসের একটা ঢেউ খেলে গেল। আচমকা একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। চকিতে দুর্যোধন ফিরে তাকাল দ্বারের দিকে।

দুর্যোধন সকলকে আপ্যায়ন করে এনে নিজ নিজ আসনে বসাল। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সিংহাসনের খুব কাছে বসল সঞ্জয়। সভার সূচনা হলো ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন দিয়ে। আচ্ছা সঞ্জয়, তুমি পাণ্ডব শিবিরে কৌরবের দূত হয়ে কি দেখলে? তাদের প্রস্তুতি কেমন হয়েছে? পাণ্ডবদের সমর্থনে কোন কোন রাজ্যের রাজা এসেছে?

সঞ্জয় দ্বিধা না করেই বলল: যাঁদের দেখলাম সেখানে তাদের মধ্যে যাদব বংশীয় অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত, ভোজদের প্রাধান্য সর্বাধিক। এছাড়া অন্যান্য বীরদের মধ্যে সাত্যকি, চেকিতান, ইরাবান ঘটোৎকচ আছেই। পাঞ্চালদের ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডীসহ দ্রুপদ এবং তাঁর সেনাবাহিনীও আছে, আরও যোগ দিয়েছে সপুত্র বিরাটরাজা।

সবচেয়ে মজার কথা হলো কৌরববংশের জরাসন্ধের ছেলে সহদেব এবং কৃষ্ণ বিদ্বেষী শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতুও পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিয়েছে। কৃষ্ণই এযুদ্ধের নেপথ্য নায়ক হয়ে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছেন। নিজে তিনি কিছু করছেন না কিন্তু তাঁর নির্দেশে সব হচ্ছে। পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল এবং যাদবদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। সবাই এখন যুদ্ধের উন্মাদনায় টগবগ করছে। তাদের বুকে অসন্তোষের আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে কৌরবদের সব পুড়িয়ে ছাই করে ছাড়বে তারা।

সঞ্জয়ের বার্তা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে রইল কিছুক্ষণ। দুর্যোধনের চোখে মুখে সত্যিকারের আতঙ্ক ফুটে উঠল। ধারালো এক ব্যক্তিত্ব সংকট সময়ে তাকে ভারী বিশিষ্ট করে তুলল। ঠোঁটের ফাঁকে একফালি হাসিও ফুটল। বলল ঃ পিতামহ আমাদের ভয় পাওয়ার মতো বোধহয় কিছু নেই। এতো আমাদের পুরনো পারিবারিক বিবাদ। বহুকাল পরে সেটা ভয়ংকর এক আত্মসংহারী রূপ নিয়েছে। যাদবেরা যেমন পাণ্ডবদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে তেমনি পৌরববংশের বিভিন্ন বংশধারা জোট বেঁধেছে কৌরবদের সঙ্গে। ভারতভূমির তিন চতুর্থাংশ পৌরবদের রাজত্ব। তারা সবাই সসৈন্যে আমার পক্ষে যোগ দিয়েছে। কারণ যাদবদের সঙ্গে পৌরবদের মনের বন্ধন হয়নি কোনদিন। রক্তের সম্পর্কে তারা কেউ আপন হলো না। দেবযানী, শর্মিষ্ঠার ঝগড়া আমাদের রক্তে। এ ঝগড়ায় শর্মিষ্ঠার বংশলতাই চিরদিন জিতেছে। এবারও তার অন্য হবে না, ইতিহাস শুধু পুনরাবৃত্তি করে। তাই সবাইকে বলি ভরসা রাখুন, আমরা জিতব। বাহুবল, লোকবল, অস্ত্রবল পাণ্ডদের চেয়ে বেশি আমাদের। এই যুদ্ধে আমাদের করায়ত্ত জয়কে কত সহজে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় তার একটা হিসেব নিকেশ সকলে মিলে আগে থেকে করা থাকলে নেতৃত্ব নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি, মান-অভিমানের ভার হাল্কা হবে।

পিতামহ দুর্যোধনের সমস্ত কথাগুলো ধৈর্য ধরে শুনল। কিন্তু নেতৃত্বের কথাটা কোথায় যেন তাকে একটু ধাক্কা দিল। তাই, একটু সময় নিয়ে বলল ঃ সঞ্জয়ের কথায় উদ্বিগ্ন হওয়ার যেমন কারণ আছে, তেমনি দুর্যোধনের নেতৃত্ব প্রসঙ্গটিও উপেক্ষা করার

নয়। কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধের সংকল্প এখন বাস্তব। দ্বারকায় গিয়ে বিক্ষুব্ধ যাদবগোষ্ঠীর কিছু রাজা এবং তাদের সৈন্যবাহিনীকে তোমার পক্ষে টেনে এনে যে দূরদর্শিতা দেখিয়েছে তার প্রশংসা করার ভাষা আমার নেই। সোজা কথায় যুদ্ধে জিততে গেলে যত খানি সেনা সংগ্রহ দরকার পাণ্ডবদের চেয়ে বেশি করে তুমি একটা সুবিধাজনক উত্তম জায়গায় ইতিমধ্যে পেঁছে গেছ। সেও তোমার বাহাদুরী। কিন্তু যুদ্ধে এহ বাহ্য। যুদ্ধে বাহুবল, অস্ত্রবলের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো নেতৃত্ব। সঠিক নেতৃত্বের জোরেই একটা অসম্ভব জয় আশ্চর্যভাবে সম্ভব হয়ে যায়। কিন্তু তোমার তো নেতৃত্বের উপর আস্থা নেই। কর্ণ ছাড়া আর সকলকে অবিশ্বাস কর তুমি। কর্ণই তোমার ভরসা। কিন্তু কর্ণ রথী নয়, সে একজন সামান্য যোদ্ধা মাত্র। তাকে নিয়ে তোমার স্বপ্ন অনেক। কর্ণের উপরে তুমি যুদ্ধের সব ভার অর্পণ কর। যুদ্ধের নেতৃত্ব তাকে দাও।

দুর্যোধন বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করল। বিব্রতভাবটা মুহূর্তে কাটিয়ে উঠে বলল: পিতামহ আমার উপর আপনার অভিমান হতে পারে কিন্তু আপনাদের উপর আস্থা নেই, একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। আপনাদের যদি বিশ্বাস না করি তা হলে কাকে বিশ্বাস করব? নেতৃত্ব নিয়ে আপনার কটাক্ষ অহেতু নয়। আপনাকে বিরূপ করতে কারা কিভাবে কথাগুলো তাদের মতো করে বলেছে আমি জানি না। আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না বলে, কে কি বলল তাই নিয়ে মন খারাপ করছেন। আপনার বিভ্রম দূর করার জন্যে যা বলেছি, অকপটে তার পুনরুক্তি করতে আমার বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই। আমি বলেছিলাম, যাঁদের দিয়ে আমি কাজ করে নেব, তাঁরা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমার উপর হয়তো তাঁদের আস্থা নেই। তাই যুদ্ধে ভয় পাচ্ছেন। সন্ধির কথা বলছেন। আমার মুখে যুদ্ধের হুংকারকে মূর্খের আস্ফালন মনে করছেন। তাঁরা কেউ বুঝতে চাইছেন না, যুদ্ধ হওয়া বা বন্ধ করা আমার একার ইচ্ছেয় হবে না। এ অবস্থায় আপনি এবং আচার্য দিনরাত পাণ্ডবদের সঙ্গে যদি সন্ধি করতে পরামর্শ

দেন তাহলে আমার পক্ষে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা কিসের আশায়, কোন ভরসায় আমার পক্ষে লড়বেন? কেন লড়বেন? প্রত্যেকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে প্রত্যাশা নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সংশয় দূর করার জন্যে বলেছি পিতামহ এবং আচার্য দ্রোণ কৌরবপক্ষে লড়বেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং আপনাদের ভয় কিসের? তখন তাঁরা পাল্টা প্রশ্ন করেছেন —শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে কতটা প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব? পাণ্ডবদের যাঁরা অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাঁরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ না করে করে রক্ষণাত্মক যুদ্ধও তো করতে পারে। যুদ্ধে জিততে গেলে যেরূপ হিংস্র এবং নিষ্ঠুর হওয়া দরকার, তাঁরা কি তা করবেন? যে মানুষ শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, অনুরাগে যুদ্ধের আগেই পাণ্ডবদের কাছে হেরে বসে আছেন তাঁরা কোন প্রাণে তাদের উপর শরবর্ষণ করবেন? এরকম প্রশ্ন কারো মনে হতেই পারে। এর অর্থ অবিশ্বাস নয়। সংশয় তো নানা কারণে হয়। একজন মানুষের বহুবিধ আবেগ, অনুভূতি, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রতিক্রিয়া দেখে কারো মনে সংশর জাগতে পারে। আবার স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধায় মানুষের চিত্ত আপ্লুত হওয়া কোন অন্যায় নয়। তবু কর্তব্য মানুষকে কর্মে অবিচল করে, কর্তব্যের কাছে কোন বন্ধু, আত্মীয়, ভ্রাতা, পুত্র বলে কিছু নেই। প্রজানুরঞ্জন রাজা রামচন্দ্র বৃহত্তর, কর্তব্যের খাতিরে প্রিয়তমা, সাধ্বী অন্তঃসত্বা স্ত্রীকে নির্বাসন দিতে কুণ্ঠিত হননি। প্রেম তাঁর রাজকর্তব্যের অন্তরায় হয়নি। আমি তাঁদের বোঝাতে পেরেছি কর্তব্যপরায়ণ পিতামহ ভীষ্ম—প্রতিজ্ঞায় যিনি কঠোর এবং আপোষহীন; দায়িত্বপরায়ণ আচার্য দ্রোণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কখনো তাঁদের দায়িত্ব কর্তব্যভ্রষ্ট হবেন না। আমি আরো মনে করি সর্বশক্তি দিয়ে পাণ্ডবের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই করবেন। আমার অনুমান, পাণ্ডবদের উপর কোন কৃপা কিংবা করুণা প্রদর্শন করবেন না।

দুর্যোধনের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনল পিতামহ। চোখে মুখে তাঁর একটা গভীর আগ্রহের ভাব ফুটে বেরোল। মনে হলো, দুর্যোধনের নিজের সংশয়, অবিশ্বাস, অভিযোগগুলো অন্যের জবানীতে বলছে। ভেতরটা তার রাগে, ক্ষোভে, ঘৃণায় এবং

এক নতুন প্রত্যয়ে শক্ত হয়ে উঠল। বলল ঃ তোমার বাক্যে সংশয় এবং অবিশ্বাস গোপন নেই। তুমি যখন আমার উপর আস্থা অর্জন করতে পারছ না তখন পাণ্ডববৈরী কর্ণকে নেতৃত্ব দাও। কর্ণ তো একাই পাণ্ডববাহিনীকে নির্মূল করবে বলেছে। এই যুদ্ধে তার চেয়ে যোগ্য নেতা আর কাউকে দেখছি না আমি।

অপমানে, রাগে কর্ণের ফর্সা মুখখানা রাঙা হয়ে গেল। তীব্র অপমানের যন্ত্রণা বিষের মতো তার সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ঃ পিতামহ আমার উপর আপনার খুব রাগ তাই না? আমি আপনার কি করেছি যে, আমাকে আঘাত করে কথা না বললে, আপনার সুখ হয় না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আপনাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, অপমান সহ্য করেও সখা দুর্যোধনকে আমি ত্যাগ করে যায়নি বলে আমার উপর বিরূপ হয়ে আছেন। আমার প্রচণ্ড পাণ্ডব বিদ্বেষ, আপনাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আপনার ইচ্ছে নয়, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরি। তাই দুর্যোধনের উপর চাপ সৃষ্টি করে আমার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে চাইছেন।

ভীষ্ম রেগে গিয়ে বলল ঃ পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের সব দোষ আমার উপর চাপিয়ে দেয়ার এত বড় স্পর্ধা কর্ণকে দিল কে দুর্যোধন?

কর্ণ একটুও রাগল না। নিরুত্তাপ গলায় বলল : পিতামহ পেঁচারা অন্ধকারে থাকে, আলো দেখলে ভয় পায়।

দাঁতে দাঁত দিয়ে কেশর ফোলা সিংহের মতো ভীষ্ম হুঙ্কার দিল ঃ কর্ণ!

পিতামহ আমার অপরাধ কোথায়? আমি তো আপনার যুদ্ধ-নীতির কথাই বলছি। যুদ্ধে পাণ্ডবরা কি করলে রক্ষা পায় তার উপর নজর রেখেই যুদ্ধ-কৌশল নির্ধারণ করছেন। আমার আপত্তিটা সেখানে। আপনি এবং আচার্য দ্রোণ বারংবার বলছেন যুদ্ধে পাণ্ডবদের প্রচুর সৈন্যক্ষয় করবেন কিন্তু পাণ্ডবদের গায়ে মরে গেলেও হাত দিতে পারবেন না। অথচ আপনি ভালো করে জানেন নেতৃত্বকে আঘাত করলে গোটা বাহিনীই বিপর্যস্ত হয়ে যায়। পাণ্ডবপক্ষের মনোবলও তাতে ভেঙে পড়বে। নিরীহ সৈন্য বধের কোন প্রয়োজন হবে না।

ভীষ্ম বেশ একটু বিরক্ত হলো। কথা বলার সময় ভুরু কুঁচকে গেল। বলল ঃ বিদ্বেষ নিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা আর যুদ্ধে জেতা এক জিনিস নয়। আমার রণণীতি হলো পাণ্ডব সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা প্রচুর বাড়িয়ে পাণ্ডবদের যুদ্ধে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা।

কর্ণ ভীষ্মকে আক্রমণ করে বলল ঃ পাণ্ডবদের বাঁচিয়ে যুদ্ধ করতে চাইছেন বলেই তাদের ব্যাপক সৈন্যক্ষয় করা ছাড়া দুর্যোধনের জন্যে করতে কিছুই চাইছেন না। নেতৃত্বই হ'লো যুদ্ধের সাফল্যের চাবিকাঠি। সেই নেতৃত্বকে আঘাত করা দরকার। নেতৃত্বের সঙ্কট এবং অভাব যত তীব্র হবে জয় তত সুনিশ্চিত হবে। দুর্যোধন জয় চায়—আত্মসমর্পণ নয়। আত্মসমর্পণ মানে তো সন্ধি করা। সন্ধি তো যুদ্ধ না করেই হতে পারতো। আপনার রণ-কৌশলে পাণ্ডবেরা লাভবান হবে। আর দুর্যোধনের পক্ষের অগণিত বীরদের প্রাণ দিতে হবে। পিতামহ বার্দ্ধক্যের শক্তি-সামর্থ নিয়ে আপনি এবং আচার্য দু'জনে পঞ্চ-পাণ্ডবের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন। আবার আমি যুদ্ধ করলে পাছে পাণ্ডবেরা প্রাণ হারায় তাই আমার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবার জন্যে কটূক্তি করছেন।

ভীষ্ম চিৎকার করে বলল ঃ দুর্যোধন, এই মানুষটাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তোমাকে স্থির করতে হবে, আমাদের দু'জনের মধ্যে তুমি কাকে বেছে নেবে ?

দুর্যোধন কোনরকম অস্বস্তিতে পড়ার আগেই কর্ণ ভীষ্মের প্রশ্নের সমাধান করে দিয়ে বলল ঃ পিতামহ, আমার অপরাধে সখা দুর্যোধনকে ত্যাগ করবেন না। আপনি এবং আচার্য গেলে ও ভীষণ একা হয়ে পড়বে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনার জীবদ্দশায় আমি রণাঙ্গণে প্রবেশ করব না। আপনার নেতৃত্বে যুদ্ধও করব না। এমন কি সখা যদি দারুণ সঙ্কটে পড়ে তা হলেও আপনার জীবদ্দশায় অস্ত্র ধরব না। এবার আপনি সুখী তো।

ভীষ্ম স্তম্ভিত।

দুর্যোধন কিছু বলার চেষ্টা করলে কর্ণ বাধা দিয়ে বলল ঃ বন্ধু, যে ত্যাগ করতে জানে কোন দুঃখ, লোভ তাকে ছোঁয় না। ত্যাগ করতে যারা ভয় পায়, অনেক নীচতা, হীনতা, মোহ ভুতের

মতো তাদের ঘাড়ে চেপে বসে। পিতামহ, আচার্য দ্রোণ তো আছেন। তাঁরা তোমাকে রক্ষা করবেন। এতে তোমার ভালো হবে। পাকে-চক্রে আমার যুদ্ধটা করা হলো না। যুদ্ধ করে এত বেশী মরতে চাই যে মরণ আমাকে স্পর্শ করতে ভয় পায়। চলি ; বিদায়।

এক দারুণ মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে রইল দুর্যোধন। দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে তখনও দেখতে পাচ্ছিল।

হঠাৎ বাদুড়ের কর্কশ চিৎকারে তার তন্ময়তা ভাঙল। গুপ্ত কক্ষের পুরনো বাসিন্দা ওরা। এ ওর পিছনে খামকা তাড়া করে মজা করছিল। পাখা ঝাপ্টাঝাপ্টি করছিল রাগে অথবা ভালবাসায়। চিঁ-চিঁ করে ডাকছিল সপ্রেমে কিংবা ক্রোধে।

দুর্যোধনের ভেতরটা দুশ্চিন্তায় কেমন বোবা হয়ে গেছে। হাঁটু জড়ো করে বসেছে। দু'হাতে জড়ানো দু'হাঁটুর উপর মুখ রেখে চুপ করে বসেছিল। মাথার মধ্যে চিন্তার একটা ঘূর্ণিঝড়। খুব অস্থির লাগছিল। অসহায় বোধ করছিল। অনুশোচনা হচ্ছিল। খুব গভীর অনুশোচনা।

রণকৌশলের পদ্ধতিগত একটা বড় ভুলের জন্যেই এতবড় পরাজয় হলো তার। এই ভুল রণকৌশলের জন্যে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ দায়ী। নেতৃত্বকে আঘাত করলে বিপর্যয় সত্যিই হতো না। কৌরবদের পরাজয়ের কারণও রণকৌশল নির্ধারণের পদ্ধতি-গত ত্রুটি। কর্ণ সময় থাকতে সাবধান করা সত্ত্বেও ভীষ্মের জন্যে শুধরে নিতে পারল না। যুদ্ধের সব ভার তাঁকে অর্পণ করা ভুল হয়েছিল। আর সে ভুলের মূল্যও দিতে হলো তাকে। আসলে ভীষ্মকে ক্ষুণ্ণ করে কিংবা অনুগতদের চটিয়ে সত্যি কিছু করা সম্ভব ছিল না। মনের একান্ত ইচ্ছেটা কাজে দেখাতে অপারগ হলো। এটা তার দোষ। নিজের প্রতি সে অন্যায় করেছিল। দুঃখ, অনুশোচনা হয় সেজন্যেই। যুদ্ধের নেতৃত্ব যদি কর্ণকে দিত তা-হলে পাঞ্চালদের এবং সমস্ত পাণ্ডবদের সে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দিত। তার একাঘ্নীবাণ থেকে অর্জুনের রক্ষা পাওয়া কঠিন হতো। ভীষ্ম রাগের বশে তাকে নেতা নির্বাচনের যে সুযোগ দিয়েছিল তার সদ্ব্যবহার করতে পারল না। দাঁতভাঙা বিষধর সাপের মতো এখন শুধু ফোঁসফোঁস করেছে। মনের জ্বালা জুড়োতে যাকে যা নয়

তাই বলেছে। ভীষ্মকেও অভিযোগ করে, তাঁর কার্যের তীব্র সমালোচনা করেছে।

পাণ্ডবদের হাতে বিপুল কৌরবসৈন্য যখন নিহত হতে লাগল, অগণিত বীর যোদ্ধারা প্রাণ দিল তখন রাগে, ক্ষোভে দুর্যোধন পিতামহকে বলল: পিতামহ, আপনি যদি পাণ্ডবদের ভালো চান, তাদের স্বার্থই যদি বড় হয় আপনার কাছে, তা-হলে আমার পক্ষে যুদ্ধ না করে তাদের পক্ষে যোগ দেয়াই ভালো ছিল। শুধু আপনার জন্যে বিশ্বস্ত কর্ণকে সেনাপতি করতে পারলাম না। কর্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে কোন আপোষ করত না। অথচ, আপনি জীবিত থাকতে সে যুদ্ধ পর্যন্ত করতে পারল না। আপনার ভরসাতেই আমি যুদ্ধে নেমেছি। আপনার রণকৌশলের জন্যেই আমার কৌরবসৈন্য ক্ষয় হচ্ছে। আপনি চোখে দেখেও রণকৌশল পাল্টাচ্ছেন না। পাণ্ডবদের হাতে পেয়েও হত্যা করছেন না। আমি চাই পাণ্ডবেরা মরুক। যে কোন মূল্যে আমি জয় চাই। আপনি একটু চেষ্টা করলে জয় এবং পাণ্ডব বধ দুই-ই হতে পারে।

পিতামহ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বলল: তোমার কাছে তিরস্কার, ভর্ৎসনা কোনদিন শুনতে হবে চিন্তা করেনি। কিন্তু তুমি যা মনে করছ ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আমি তোমার জন্যে মরতে পারি, কিন্তু পাণ্ডবদের হারিয়ে দেব মুহূর্তে—এই ভাবনা অবাস্তব। কেউ যদি তোমাকে বলে থাকে, মিথ্যে আস্ফালন করেছে সে। রণনীতি কিছু বোঝে না। উন্মাদ।

পিতামহ যুদ্ধের দশ দিন হয়ে গেল অথচ একজন পাণ্ডবও মরল না। আমি কত ভাই, বন্ধু, আত্মীয় এবং কৌরব সৈন্য হারালাম। পাণ্ডবদের তুলনায় যুদ্ধে আমাদের ক্ষয় ক্ষতির অঙ্ক বেশি। আপনি সেজন্যে একটুও চিন্তিত নন। কৌশলে পাণ্ডবদের রক্ষা করে আপনি শত্রুতা করছেন আমার সঙ্গে।

দুর্যোধন তুমি চুপ কর।

পিতামহ চুপ করে তো এতদিন ছিলাম। কিন্তু তাতে লাভ হলো কি? আমি আপনার উপর ভরসা করে এই বিরাট যুদ্ধে নেমেছি। বন্ধু কর্ণের রণকৌশল গ্রহণ করে পাণ্ডবেরা আমাদের ক্রমাগত হারাচ্ছে। আর আমরা আপনার রণকৌশল গ্রহণ করে

পাণ্ডবদের রোজ জিতিয়ে দিচ্ছি। যুদ্ধে আপনি দেবতাদের বিক্রম এবং শক্তিকে হারিয়ে দিয়েছেন। পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে আপনার সেই তেজ, বিক্রম কোথায় গেল ? আপনি চেষ্টা করুন পাণ্ডবদের হত্যা করতে। মন্ত্রণাকক্ষে ক্রুদ্ধ হয়ে আপনি বলেছিলেন, ইচ্ছে করলে পাঞ্চাল, পাণ্ডব, যাদব সবাইকে যুদ্ধে ছারখার করতে পারেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সে বিক্রম দেখতে পাচ্ছি না কেন ? আমার উপর যদি রাগ, বিদ্বেষ থাকে আর পাণ্ডবদের উপর দরদ, মমতা, প্রীতি থাকে, তাদের হত্যা করা যদি কষ্টসাধ্য হয়, তা-হলে আপাতত যুদ্ধটা কর্ণের হাতে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিন। কর্ণ আর কিছু না হোক পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। সমস্ত সৈন্যসহ পাণ্ডব এবং পাঞ্চালদের সে জয় করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কারণ, কর্ণই একমাত্র ব্যক্তি যে মনেপ্রাণে আমার জয় চায়।

দুর্যোধনের কথায় ভীষ্ম রাগল কিন্তু সেনাপতিত্ব ত্যাগের কোন কথা বলল না। অপমানে মুখ রাঙা করে বলল ঃ পাণ্ডবদের সত্যি জয় করা যায় না, আগামীকাল মরণ পণ করে যুদ্ধ করে প্রমাণ করে দেব পাণ্ডবদের হারানো সহজ নয়।

প্রমাণ দিতে ভীষ্ম কার্যত তৃতীয় পাণ্ডবের কাছে অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করল। আর প্রিয়তম অর্জুন বাণে বাণে তাঁর শরীরটাকে ঝাঁঝরা করে দিল। ভীষ্ম ইচ্ছেমৃত্যু বরণ করে পাণ্ডবদের অজেয় প্রমাণ করল। পিতামহের বিশ্বাসঘাতকতা দুর্যোধন ভুলতে পারে না। যুদ্ধের ভরাডুবি কার্যত তিনিই করে গেছেন। তাই তাঁর পতনে শোকের বদলে ধিক্কার দিল।

পরবর্তী সেনাপতি হলেন আচার্য দ্রোণ। কিন্তু যুদ্ধের হেরফের হলো না তাতে। পাণ্ডবদের হাতে প্রতিদিন বহু সৈন্য নিহত হতে লাগল। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় তার ভেতরটা তেতে উঠল। কিছু ভালো লাগছিল না। চোখে মুখে তার অসন্তোষ ফুটে বেরোল। পরাজয়ের অপমান এত গভীরভাবে তার বুকে বাজল, যে রাগতস্বরে দ্রোণকে বলল ঃ আচার্য আমার পক্ষে জয়প্রার্থী পুরুষেরা সবাই একে একে নিহত হচ্ছে কেন ? কৌরবপক্ষ ক্রমেই বীরশূন্য হচ্ছে। তবু আপনারা পাণ্ডবদের নেতৃত্বের গায়ে কেউ আঁচড়টি লাগতে দিচ্ছেন না। আপনারা ঠিক মতো কর্তব্য করছেন

না। ক্ষমতার মোহে কর্ণের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিতেও রাজি নন। পান্ডবদের ক্ষতির কথা ভেবেই হয়তো কর্ণ যুদ্ধ করুক এটা আপনারা কেউ চান না। অথচ কর্ণই একমাত্র মানুষ যে সর্বান্তকরণে আমার জয় চায়। কর্ণের মতো এমন করে পিতামহ এবং আপনি চাইলে বোধ হয় পান্ডবেরা কেউ জীবিত থাকত না। আমার দুর্ভাগ্যের জন্য আপনারা দায়ী। আপনাদের উপর নির্ভর করে, বিশ্বাস করে ভুল করেছি। আমার ভুল সিদ্ধান্তের জন্যে এভাবে মার খাচ্ছি।

বুকের মধ্যে ফিস ফিস করে চাপা গলায় অদৃশ্য মনটা লম্বা শ্বাস ফেলে উচ্চারণ করল ঃ হায়রে ভাগ্য! জয়টা শুধু কল্পনায় রয়ে গেল। করায়ত্ত হলো কৈ? আর কি হবে? একটা দারুণ হতাশায় মনটা প্রতিদিন ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মন খারাপ হয়ে গেলে মুক্তির জন্যে ভেতরটা ছটফটিয়ে উঠে। বন্দী হয়ে জীবনটা কখনো কাটায়নি বলেই জানা ছিল না শরীরের মধ্যে, মনের মধ্যে মুক্তির এত আকুলতা এত ছটফটানি থাকে। জীবনের আসল মানেটা তা-হলে কি মুক্তি! কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই মোহ এবং লোভ নিয়ে একটা বন্দীদশার ভেতর জীবনটা কাটিয়ে দেয়।

গুহার ভেতর সে হাঁফিয়ে উঠল। পালিয়ে এখানে বেঁচে আছে বটে, কিন্তু কোনক্রমে। প্রশ্বাস নেয়া আর নিশ্বাস ফেলা এবং বেঁচে থাকার ভেতর তফাৎটা যে কতবড় দুর্যোধন অনুভব করল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের আলো সুড়ঙ্গ ধরে ভেতরটা আলোকিত করেছে। জমাট অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়েছে। দুর্যোধন উঠে দাঁড়াল। সুড়ঙ্গের ফাঁক দিয়ে তার চোখটা গিয়ে পড়ল দেবদারু গাছের একবারে ছুঁচোল মাথায়। গোলাপি গলার জঙ্গুলে শকুন উড়ে এসে বসল সেখানে। শকুনের ভারে গাছের ডালটা একটু নুয়ে গেল। আর তখনই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। মনে হলো তাকে দেখেই সে ডানা দুটো একবার মেলল উড়বার জন্যে। তারপর কি ভেবে আবার ডানা গুটিয়ে বসল চুপ করে। নিচের দিকে গলাটাকে লম্বা করে দিয়ে বিশ্রী ফাঁসফেঁসে গলায় ডাকল বেশ কয়েকবার। অনেকক্ষণ লম্বা দেবদারু গাছের মাথার দিকে এবং শকুনটার দিকে চেয়ে রইল। শকুনটা দেখা

থেকে মনটা তার ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। গুহা থেকে বাইরে বেরোনোর জন্যে পা যখন বাড়াল ঠিক সেই সময় শকুনটা উড়ে এসে গাছের মগডালে বসল। মনটা চমকে গেল অমঙ্গল আশঙ্কায়। ভেতরটা অস্থির হলো। উপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। এখন অনেক কাজ বাকি। পাণ্ডবদের উপর প্রতিশোধ নেয়া হয়নি। কৃষ্ণকে হারানো হয়নি, পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয়ের জন্যে কিছু করতে পারেনি। এত অতৃপ্তি নিয়ে মরেও শান্তি পাবে না। বেঁচে থাকার মতো তার অনেক কিছু আছে। বিমর্ষ মুখে কথাগুলো ভাবছিল আপন মনে।

রোদটা এখন চড়েছে। হেমন্তের শিশির ভেজা গাছের পাতাগুলো সব শুকিয়ে গেছে। রোদের আলো পিছলে পড়ছে পাতার গা থেকে। একটা ঝাঁকড়া কাঁটাগাছ সুড়ঙ্গের মুখটা আগলে আছে। কিন্তু অজস্র ফুল এসেছে ওর ডালে। টুনটুনি পাখির দল মনের আনন্দে ছোট শরীরটা নিয়ে এ-ডাল ও-ডাল করছে। কিচির মিচির করে ডাকছে। মন্থর বাতাসে ফুলের স্তবক ধীরে ধীরে দুলছে। দুর্যোধনের ভেতরটাও আশা-নিরাশায় আন্দোলিত হচ্ছে।

সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে সামনের পাহাড়ের চূড়া, ঘন নীল আকাশ চোখে পড়ছিল। একটা পাহাড়ী বাজ উড়ছিল পাক দিয়ে দিয়ে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকিয়ে কি খুঁজছিল কে জানে? দুর্যোধনের মনে হলো বেচারা বাজ তার মতো একা। একেবারে একা।

দুর্যোধনের ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। সেই সঙ্গে তেষ্টা। খাদ্যের সন্ধানে গুহা থেকে একবার বেরোতে হবে তাকে। বর্ম পরল। পিঠে তূণভরা শর তুলে নিল। এক হাতে গদা অন্য হাতে ধনু নিয়ে খুব সাবধানে দেয়াল ধরে এক পা এক পা করে উপরের দিকে উঠতে লাগল। নিজেকে তার মনে হলো আহত বাঘ শিকারের খোঁজে গুহা ছেড়ে বেরোচ্ছে চারদিকে সতর্ক চোখ রেখে।

কান খাড়া করে চলেছে দুর্যোধন। সাবধানতা নিয়ে উপরে উঠছে। হঠাৎ-ই পায়ের শব্দ, মানুষের কণ্ঠস্বর পেয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই সুড়ঙ্গের সিঁড়ির বাঁকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়াল। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে

থাকল। পাহাড় চূড়ার বেশ কিছুটা নিচে দাঁড়িয়ে কে যেন কাকে বলল—এইখানে একটা পুরনো গুহা আছে। জানোয়াররা বাস করে। ওখানে মানুষ যেতে ভয় পায়। কাঁটাঝোপের আড়াল সরিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতরে যাওয়া কঠিন।

দুর্যোধনের ভেতরটা কেঁপে উঠল। লোকটি কে, কাকে দেখিয়ে কথাগুলো বলছে, সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বোঝার উপায় নেই। তবে লোকটা যে কাল সন্ধ্যের আবছা আলোয় দেখা সেই ব্যাধ যুবক তাতে সন্দেহ রইল না। পাণ্ডবেরা এবং তাদের সখা কৃষ্ণ তাহলে তার গোপন আস্তানা টের পেয়ে গেছে। বাঁদিকে বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠল। এখন খুব দ্রুত ভাবার সময়। অনেক ভাবনা। হঠাৎ-ই ভানুমতীর কথা মনে এল। মনকে বলল—না, ভানুমতী, না। পারলাম না। জেতার চেষ্টা করেও জিততে পারছি কৈ? অদৃষ্ট আমায় জিততে দেবে না। কপালে কি আছে কে জানে?

সবরকম সাবধানতা নিয়ে আবার গুহার অন্ধকার কক্ষে ফিরল দুর্যোধন। কক্ষের গভীরে ঢুকল। এদিকটা অন্ধকার এত গাঢ় যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখ বরাবর স্পষ্ট দেখতে পেল।

বিপদ সংকেত পাঠানোর মতো হঠাৎ একদল পাখি আর্ত চিৎকার করে আকাশে উড়ল। কথা বলতে বলতে কারা যেন গুহার মুখের দিকে এগিয়ে এল। দুর্যোধন চমকাল। দু'পা মাটিতে গেঁথে গেল তার। শরীরের সমস্ত স্নায়ুকে সচেতনার চরমে পেঁছে দিয়ে আগন্তুকেরা ক'জন ছায়া গুণে আর কণ্ঠস্বর শুনে বোঝার চেষ্টা করল।

হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের ডাক শুনল। দুর্যোধন! তুমি পালাবে কোথায়? গুহার ভেতর লুকিয়ে আমাদের চোখে ধুলো দেয়া সহজ নয়। গুহা ছেড়ে বাইরে বেরোও! আত্মসমর্পন কর। তুমি খুনী। তোমার কোন ক্ষমা হয় না। তোমার নাম উচ্চারণ করতেও আমার ঘেন্না হয়। তুমি বাইরে এস।

যুধিষ্ঠিরের কথাগুলো পাহারাদারের হাঁকের মতো সুড়ঙ্গের ভেতর গম্‌গম্ করে উঠল। দুর্যোধনের বুকটা ধরাস করে উঠল। কেমন একটা বিভ্রান্ত উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল।

বার বার শিহরিত হতে লাগল সর্বাঙ্গ। এরকম আগে কখনও হয়নি। যুধিষ্ঠিরের বাক্যে রাগ হলো খুব। কানে আঙুল চেপে মনে মনে বলল : তোমার কোন কথায় আজ আমি রাগ করব না। মুখবুজে সব তিরস্কার গালমন্দ সহ্য করার পরীক্ষা দিয়ে যাব। এখানে আমি আছি, জানতেও দেব না।

দুর্যোধনের সাড়া না পেয়ে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের দিকে তাকাল। কৃষ্ণ সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে কি যেন খুঁজছিল। হয়তো মানুষের পায়ের দাগ কিংবা অন্য কোন চিহ্ন খুঁজছে। সুড়ঙ্গের সিঁড়ি থেকে তার চোখ না তুলে বলল : ধর্মরাজ। চুপ করে থেক না। দুর্যোধনের দুর্বল এবং নরম জায়গাগুলো ক্রমাগত আঘাত কর। রাগে আত্মবিস্মৃত হয়, এমন সব কথা বল। সুড়ঙ্গের দেয়ালে আঙুলের ছাপ, সিঁড়ির ধাপে রক্তের ফোঁটা, আগাছাগুলো পায়ে মুড়োন—দুর্যোধন যে দ্বৈপায়নের গুহায় লুকিয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই।

ভীম বলল ঃ গুহায় নেমে চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে আনব কি ?

কৃষ্ণের অধরে সেই অনির্বচনীয় রহস্যময় হাসি হঠাৎ বর্তুল হলো। বলল ঃ এই গুহার মানচিত্র তোমার জানা নেই। গুহার গোলক ধাঁধায় একজন শক্তিমান রণকৌশলী মানুষও খুব সহজে হেরে যায়। প্রবল পরাক্রান্ত কালযবন সসৈন্য মথুরায় আমাকে আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার্থে আমার প্রিয়স্থান গোমন্তক গিরি গুহায় ঢুকে পড়ি। কালযবন আমাকে ধাওয়া করতে গিরিগুহায় ঢুকল। গুহার অন্ধকারে সে পথ হারাল এবং বিনাযুদ্ধে অতর্কিত আঘাতে নিহত হলো, ওই ভুল তুমি কর না। ধৈর্য ধর, দুর্যোধন নিজেই ধরা দেবে। যা করার অগ্রজ যুধিষ্ঠির করবেন।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কৃষ্ণের চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। কণ্ঠস্বরে তার ঘৃণা ও উষ্মা প্রকাশ পেল। বলল ঃ দুর্যোধন ; তুমি ক্ষত্রিয় কুলের কলঙ্ক। কৌরব বংশের লজ্জা। ক্ষত্রকুলে যার জন্ম সে কখনো যুদ্ধে ভয় পায় না। কাপুরুষের মতো ভীরুতা নিয়ে লুকিয়ে থাকে না। তোমার বীরগর্বে ধিক্কার। বীরত্বের আস্ফালন তোমাকে মানায় না। বীর করে মুখোমুখি লড়াই, হয় জয়, না হয়

পরাজয়। একজন ক্ষত্রিয় জীবন সার্থক করতে চায়, বীরধর্ম পালন করে। মৃত্যু কিংবা পরাজয় নিশ্চিত জেনেও ভয়াল বিপদ সঙ্কুল আবর্তের মধ্যে বীর অকুণ্ঠ উৎসাহে ঝাঁপ দেয়। যুদ্ধের তাণ্ডবের সে মুখোমুখি হয় নিশ্চিত মৃত্যুর। তুমি কি? ক্ষত্রিয়রা তোমার পলায়নের কথা শুনলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। দুর্যোধন, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো। উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমার সেই দম্ভ, ক্রোধ, অহংকার কোথায় গেল? বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে তুমি নিজের কুল এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়কুলকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছ। যুদ্ধ করে হেরেছ। তোমার অহংকারের মুখে ছাই পড়েছে। এখন লুকিয়ে কেন? গুহা থেকে বাইরে বেরোও। বিনা যুদ্ধে তোমাকে বাঁচতে দেব না।

তবু দুর্যোধন নিরুত্তর। মৃত্যু ভয়ে কেমন বোবা হয়ে গেছে। খুব সামান্য কথাতেই আগে অপমানবোধ করত। রাগে অস্থির হতো। অসহায় বোধ করত। আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিত। আজ সে সব কিছুই করল না। একটা বিষাদ অনুভব করছিল। খুব গভীর বিষাদ। চাপা একটা সতর্কতাসূচক শব্দ করে নিজের মনে বলল: যে যা বলুক শুনে যাব। কোন কথার জবাব দেবো না। এক সময় যুধিষ্ঠির চিৎকার করে ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে। ফিরে যাবে। একটু ধৈর্য ধরলে কেউ জানবে না এখানে আছি। একটা সূত্রে খবর পেয়ে তারা এসেছে। কিন্তু সেই জানাটা সঠিক নয় প্রমাণ করতে তাকে আত্মসংযমের পরীক্ষা দিতে হবে।

তবু চোখের দৃষ্টি তার হরিণের মতো ভীত ও চঞ্চল। হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছিল ভয়ে। বুকের ভেতর একটা উল্টোরকম এক উথাল পাথাল।

যুধিষ্ঠির কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে সুড়ঙ্গের সিঁড়িটার দিকে চেয়ে রইল শূন্য চোখে। আস্তে আস্তে তার ভিতরটা কঠিন হতে লাগল। কণ্ঠে লাগল রক্তের উত্তাপ। বলল: দুর্যোধন পৃথিবীতে কোন মানুষ অমর নয়। কিন্তু অমরত্বের প্রয়াসী। বীর খোঁজে মৃত্যুকে উত্তরণের পথ। খ্যাতির পথ। মানুষের স্মৃতির মুকুরে চিরন্তন হয়ে থাকার জন্যে বীর প্রাণপণ করে যুদ্ধ করে। একদিন

এই যুদ্ধ তুমি চেয়েছিলে। তোমার আমার একজনের চিরন্তন পরাজয় আর মৃত্যুতে এ যুদ্ধের শেষ হবে। সেই শেষ যুদ্ধ এখনও বাকি। গুহা থেকে বেরিয়ে যুদ্ধ কর। তুমি তো যুদ্ধ করে বিবাদের মীমাংসা চেয়েছে। লুকিয়ে থাকলে ফয়সালা হয় কি করে?

দুর্যোধনের ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলে—ফয়সালার বাকী কি আছে? যা হওয়ার হয়ে গেছে। বাকী শুধু আমার মরণ। সেটুকু না হলেও তোমাদের রাজ্য সিংহাসন লাভের কোন বাধা নেই। মিছে মিছে আমাকে টেনে এনে বে-ইজ্জত করতে চাইছ কেন? আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর কেন? ভোগে আমার আর রুচি নেই। আমি অনেকদিন সাগরমেখলা পৃথিবী একা ভোগ করেছি। এবার তোমাদের পালা। মহামানী দুর্যোধন পাণ্ডু পুত্রদের দয়া, অনুগ্রহ, করুণা নিয়ে বেঁচে থাকবে কী করে? দুর্যোধন মানবহ্নিতে পুড়ছে। তার সেই জ্বালা বাইরে থেকে তোমরা অনুমানও করতে পারবে না। আমি এতকাল সমস্ত রাজাদের মাথার মণি হয়ে দীপ্তি ছড়িয়েছি, সেই আমি তো আর রাতারাতি বদলে যেতে পারি না। বদলাতেও সময় লাগে। এই মুহূর্তে কী করে তোমাদের সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়াই? অনুগত বশংবদের মতো কিংবা ভৃত্যের মতো তোমাদের পেছনে পেছনে ঘুরব, তোমাদের হুকুম তামিল করব? এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো। ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে রেখে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা দিচ্ছে। চিরকাল যে মানুষ শত্রুকে গ্রাহ্য করেনি, শত্রুর মাথায় পা রেখে চলতে অভ্যস্ত, মাথা হেঁট করে এই গুহা ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে তার আত্মসম্মানে বাধে। আমি পারব না যুধিষ্ঠির। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়ে এই অন্ধকার গুহায় মরব তবু বাইরে এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে বলতে পারব না, আমায় তুমি এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। কিন্তু তোমরা, আমাকে ক্ষমা করবে কেন? তুমি চাইলেও কৃষ্ণ চায় না আমার বেঁচে থাকা। আমাকে আমার মতো করে বাঁচতে হবে। সেই সময়টুকু শুধু আমার জন্যে বরাদ্দ কর। অগ্রজ, যাঁরা এই যুদ্ধে নিঃস্বার্থভাবে মরেছে, তাদের কাছে আমার ঋণ অনেক। নিজের বেঁচে থাকার জন্যে, সুখের জন্যে এত নীচে নামতে পারব না। যুদ্ধ করে তাঁদের মৃত্যুর

প্রতিশোধ যদি নাও নিতে পারি প্রতিদানে নিজের জীবন উৎসর্গ তো করতে পারব। অগ্রজ, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ক্ষুরধারে প্রশংসা করে তুমি শুধু আমাকে অপমান করছ। আমার ধৈর্য ভঙ্গ করছ। তুমি অন্য কথা বল।

দুর্যোধনের মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সাগর উথাল-পাথাল করল। যুধিষ্ঠির কিংবা কৃষ্ণ কেউ তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারল না। যুধিষ্ঠিরের মুখে একটু কাঠিন্য দেখা গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু ভেবে পুনরায় দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে বলল : দুর্যোধন চুপ করে থাকলে তো চলবে না। তোমাকে উদ্যোগ নিতে হবে। মানুষ ভাগ্যের হাতে যে পুতুল; আমাদের চেয়ে বেশি কে জানে? কিন্তু যে মানুষ সংগ্রামী; সে কারো হাতে পুতুল নয়। সে নানা বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে সংগ্রামী মনের পরিচয় দেয়। যুদ্ধে জয় এবং পরাজয় দুই আছে। কিন্তু যোদ্ধার ধর্ম শুধু যুদ্ধ করা, জয়-পরাজয় তার নয়। আঘাতের যন্ত্রণা তার, কিন্তু সাফল্যেব তৃপ্তি তার নয়। শ্রম তার, কিন্তু চরিতার্থতার অধিকারী নয় সে। জীবন সংগ্রামী-তার দুর্ভাগ্যকে, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসকে মুছতে চেষ্টা করে তার বীর্য দিয়ে, তেজ দিয়েও প্রেরণা দিয়ে, আজীবনের প্রচেষ্টা দিয়ে, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিয়ে। কিন্তু তুমি কি? একদিন দম্ভ করে, আস্ফালন করে বলেছিলে—বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমি দেব না। তোমার সেই গর্বোদ্ধত পৌরুষের হুংকার, রাগ, অহঙ্কার কোথায় গেল?

তবু দুর্যোধনের কোন সাড়া মিলল না। যুধিষ্ঠিরের গালমন্দ, তিরস্কার তার বুকে কোন ঢেউ তুলল না। স্থানুবৎ গুহায় বসে রইল। নিস্পৃহ এবং নির্বিকার একটা পারিপার্শ্বিক তৈরী করে নিজেকে নির্বাসিত করল সেখানে। বাইরের শব্দময় ঘটনাবহুল পৃথিবীর কোলাহলের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তাই, যুধিষ্ঠিরের উগরে দেওয়া ঘৃণা, বিদ্রূপের নির্মম, আক্রমণাত্মক কণ্ঠস্বরটি তার ভিতরের সব স্পন্দন যেন কয়েক মিনিটের জন্যে স্তব্ধ করে রাখল। যেন বা থেমে গেল রক্তের প্রবাহমানতা। বন্ধ হয়ে গেল হৃৎপিন্ড। এভাবে নিঃশব্দে সব অপমান বুকের ভেতর

শুষে নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। একটা নিরুপায় অসহায়তা এবং ভীতি তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। আত্মধিক্কার আর অপমান তার ভিতরে মাথা কুটে কুটে একটা বেরোনোর পথ খুঁজছিল। নিরুচ্চারে নিজেকে প্রশ্ন করল এত অপমান সয়ে দুর্যোধন এখনও বেঁচে আছে কি করে? নিজের সহিষ্ণুতায় নিজেই অবাক হলো। এত বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ একজনকে করতেই বা পারে কি করে আর একজন?

এখন তার কি করা উচিত? অনাহারে তৃষ্ণায় শুকিয়ে মরা, নিজের অস্ত্রে আত্মহত্যা করা অথবা গুহা থেকে বাইরে এসে বীরের মতো যুদ্ধ করে মরা। অর্থাৎ, মরা ছাড়া তার সামনে দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই বাঁচার। বেঁচে থেকে মরে থাকার চেয়ে মরে বাঁচাই শ্রেয়। তবু মরার কথায় তার বড় ভয় হলো। বুকের মধ্যে কেমন এক অচেনা ব্যথা চিনচিন করতে থাকে। কেমন অদ্ভুত লাগে একটা সিরসিরে ভাব। এই জীবনটার উপর তার বড় মায়া। একে ছেড়ে যেতে হবে ভাবলে মরার ইচ্ছেটাই মরে যায়।

পৃথিবীতে সবাই বাঁচতে চায়। যে কোন ভাবে বাঁচাও বাঁচা। বেঁচে থাকলে কিছু করার থাকে তার। কিন্তু মরে গেলে তো সব চুকে বুকে গেল। কিন্তু বেঁচে মরে থাকলে সেটা বাঁচা। সে সর্বাংশে মরেনা। তার কিছু থেকে যায়। জাগতিক পরিচয়েও সে আছে। সে এক ভিন্ন অস্তিত্ব, ভিন্ন অনুভূতি। পৃথিবীতে এই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাই বেশি। তাদের সংখ্যা না হয় আরো একটা বাড়বে। এই ভাবনাটা অনুক্ষণ তার ভিতরে ভিতরে ঘুণ পোকার মতো মৃত্যুকীট ক্ষয় করে চলেছে। এই বিপদ অনুভূতিতে তার মনটা ছেয়ে রইল।

দুর্যোধনের দিক থেকে কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে যুধিষ্ঠির বিমূঢ়ের মতো কৃষ্ণের দিকে চেয়ে রইল। জ্যেষ্ঠকে ব্যর্থ ও হতাশ হতে দেখে ভীম নিম্ন গলায় বলর: ধর্মরাজ আমি তোমার মতো গুছিয়ে, ভদ্রভাবে কথা বলতে জানি না। আমার অত বুদ্ধি-ও নেই। আমার অল্পবুদ্ধিতে বুঝেছি, যে মানুষ লঘু-গুরু মানে না, শত্রু-মিত্র সবাইকে অপমান করে তাকে বাবা বাছা করে কোন লাভ হয় না। সে শুধু পেয়ে বসে। ভদ্রতাকে দুর্বলতা মনে করে। দুর্জনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করাই শাস্ত্রীয় বিধি। ভালো কথা এরা

বোঝে না। দুর্ব্যবহারের জবাব দুর্ব্যবহার করেই দিতে হয়। কথায় বলে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। দুর্যোধনকে গুহা থেকে টেনে বার করা তোমার কর্ম নয়। মারতে মারতে গুহা থেকে বার করে আনতে হবে ওকে। তারপর সবাই মিলে মার। অগ্রজ, তুমি হাজার ডাকলেও ও সাড়া দেবে না। চুপ করে থেকে তোমাকে ধোঁকা দেবে। কিন্তু আমি ওর চালাকীতে ভুলছি না। তুমি আমাকে শুধু আদেশ কর।

যুধিষ্ঠির করুণ মুখে মাথা নেড়ে বলল: তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। কেবল গুহা থেকে তাকে বাইরে আন।

ভীম একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে ডাকল: দুর্যোধন। কেশর ফোলা সিংহের গর্জনের মতো তার ডাকে গুহার ভেতরটা গম গম করে উঠল। রাগের চোখে কিছুক্ষণ গুহার ভাঙা-চোড়া দুর্গম সিঁড়ির দিকে চেয়ে রইল। তারপর, হঠাৎ খুব জোরে অট্টহাস্য করতে করতে বলল: তুমি কি বোকা! অনন্তকাল চুপ করে থাকলেও এখান হতে আমরা কেউ নড়ব না। হতাশ হয়ে ফিরে যাব বলেও আসিনি। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানেই থাক তোমাকে খুঁজে বার করবই। আমার কাছ থেকে তোমার রেহাই নেই। আমি তোমার নিয়তি। তোমার জীবন; মরণ। তোমার মরণও আমার হাতে। তুমি পালাবে কোথায়? বিধিলিপি কে কবে লঙ্ঘন করেছে? চেষ্টা অবশ্য করেছিলে। কিশোর ভীমকে বিষ দিয়ে মারতে চেয়েছিলে, উল্টে তোমাকে মারার জন্যেই ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে রাখল। তখন কি জানতাম, আমার হাতে তুমি মরবে। শান্তিগৃহে দ্যূতক্রীড়ায় পণে পরাজিতা দ্রৌপদীকে তোমরা বারাঙ্গনা বলে অপমান শুধু করনি, কু-ইঙ্গিত করে তোমার কোলে বসার আহ্বান করলে তখনই জানলাম আমার হাতে তোমার মরণ অনিবার্য। তোমার নিয়তি একগাদা লোকের মাঝে আমাকে দিয়ে কথাটা কবুল করে নিল। প্রতিজ্ঞায় ভীম আর ভীষ্মের কোন তফাৎ নেই। ভীম যুধিষ্ঠির নয়, ভীম ক্ষমা করতে জানে না। ভীম তার প্রতিজ্ঞার কথা ভোলে না। পাছে ভুলে যায়, তাই রাতে ঘুমোয় না। চোদ্দ বছর আমি ঘুমোইনি দুর্যোধন। ঘৃণা-বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসার শানে শানিয়ে তুলেছি আমার সংকল্প।

প্রতিজ্ঞায় আমি ভীষ্মের চেয়ে নির্মম নিষ্ঠুর। দুর্যোধন মনে আছে, ভ্রাতৃবধূ পাঞ্চালীর লজ্জা কেড়ে নেয়ার জবাব দিতে বর্বরের মতো দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান করেছি, মুখে মেখেছি, দু'হাত ভরে নিয়ে দ্রৌপদীর কেশদাম রাঙিয়ে দিয়েছি। আমার ভয়ঙ্কর শপথ ভয়ংকরভাবে পালন করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইনি। আমার হাত কাঁপেনি। বিবেক প্রশ্ন করেনি। দুর্যোধন, নরাধমের মতো যে উরুদেশে দ্রৌপদীকে আহবান করেছিলে সেই উরু গদা দিয়ে রেণু রেণু করার প্রতিজ্ঞা পূরণ করে শাল্মলী তরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় চোদ্দ বছর পরে ঘুমোব। লম্বা ঘুম। শান্তির ঘুম। উরু ভগ্ন অবস্থায় তোমাকে না দেখা পর্যন্ত দ্রৌপদীর মনে শান্তি নেই, সুখ নেই। আমিও স্বস্তিতে নেই। তুমিও রেহাই পাবেনা।

দুর্যাধনের ভেতরটা অপমানে পাগল পাগল লাগল। একটা জ্বালাধরা অনুভূতিতে তার দু'চোখ জ্বালা করতে লাগল। ভীম তার প্রতি জমে ওঠা ঘৃণাটাই যেন উগরে দিল। ওর কথাবার্তার ভেতর একরকম চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। এক অন্ধ নীরব পাশবিক ক্রোধ আছে। ভীমের অপমানকর কথাগুলো শোনার পরে যে কোন ভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই দুর্যোধনের মরে গেল। রাগে তার ভেতরটা অশান্ত হয়ে উঠল। নিজের অস্তিত্ব এবং স্বকীয়তা মুছে দিয়ে এভাবে বেঁচে থাকার কষ্ট, যন্ত্রণা, অপমান ভোগ করার কোন মানে নেই। নিজের উপর তার ভীষণ ঘেন্না হলো। একে কেউ বাঁচা বলে? বেঁকা হয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে সাধারণ মানুষের মতো বেঁচে থাকার ভেতর সুখ নেই কোন। তাতে নিজেকে বড় দীন আর অভিশপ্ত মনে হয়।

ভেতরে ভয়মিশ্রিত উত্তেজনার ভাবটা আর নেই। দুর্যোধন ভাবছিল বেঁচে থাকার মধ্যে যদি তেমন জৌলুস নাই-ই থাকে, তবে মরণে জৌলুস একটু এলে ভালই লাগবে। ভীমের বাক্যবাণে বিদ্ধ অন্তকরণে প্রথম অনুভব করল জোর করে বাঁচতে গেলে তাতে দাগই ধরে। কলঙ্ক তাতে বাড়ে। মাথা হেঁট করে হার স্বীকার করা যায়, কিন্তু লড়াই করার জন্যে অন্য মানুষ হয়ে উঠতে হয়। নিজের মেরুদণ্ডটা সোজা রাখা দরকার নিজের জন্যে।

প্রিয়তম ভ্রাতা দুঃশাসনের প্রাণঘাতক ভীম জীবিত এখনও।

তার মৃত্যুর বদলা নেয়া হয়নি। নরাধম ভীম তাকেও শাসাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। দম্ভ করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে। ভীমের ধৃষ্টতা তাকে অবাক করল। নিজেকে তার ক্লীব মনে হলো। ক্লীব না হলে গুহার অন্ধকারে লুকিয়ে ভীমের মতো বর্বরের বক্তৃতা শোনে কেউ? একথাটা মনে হতে তার গায়ের লোম রাগে, ঘৃণায় খাঁড়া হলো। বুকের মধ্যে আর একটা ঝড়ো বাতাসের দোলা।

দুর্যোধনের ভিতরটা আস্তে আস্তে কঠিন হচ্ছিল। দানা বেঁধে উঠল এক কঠিন প্রতিরোধ। এতক্ষণ পরে যেন অশান্ত মনের ভেতর প্রত্যাখানের ভাবটা এসেছে। দুঃশাসনের মৃত্যু দৃশ্যটা হঠাৎ তার স্পর্শকাতর মনকে উত্তেজিত করল। বুকটা দুঃশাসনের জন্যে হাহাকার করে উঠল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে হাহাকার ভরা পরিবেশে কবন্ধ শব দিয়ে কাড়াকাড়ি, শিয়াল কুকুরের রেষারেষি, আহত, মুমূর্ষু সৈনিকের আর্তি কান্নাকাটি তাকে স্থির থাকতে দিল না। মুখ বিকৃত করল দুর্যোধন। বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। দাঁতে দাঁত দিয়ে ভেতরের দুরন্ত আক্রোশটার সঙ্গে যুঝতে লাগল। ভীমের মতো নরাধম বর্বরের বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। তবু এই নিষ্ঠুর নর-রাক্ষসেরা পৃথিবীতে জন্মায়। কেন জন্মায়—এটাই আশ্চর্য!

এই বর্বর মানুষটা জীবনে একটা দিনও তাদের সুখে থাকতে দেয়নি এ কথাটা মনে হতেই দিশেহারা ক্রোধে তার ভেতরটা গর্জে উঠল। গুহার ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল: ভীম তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছ। অধিকারের বাইরে কথা বলছ। তুমি মানুষ নও, নরপশু। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আমার ঘেন্না হয়। তোমার আস্ফালন বন্ধ কর। ভুলে যেও না, চোদ্দটা বছর আমি বসে নেই। আরামে দিন কাটায়নি। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভয়ঙ্কর-তাঁর সঙ্গে তোমার মতো নরপশুর নিষ্ঠুরতা কোন তুলনাই চলে না। নিজেকে তুমি কি ভাব? তোমার শাসানিতে আমি একটুও ভীত নই। তাই তোমাকে ঘায়েল করার জন্যে প্রতিহিংসার সমুচিত জবাব দেবার জন্যেই লোহার ভীম তৈরী করে চোদ্দ বছর ধরে তার উপর গদার মার অভ্যাস করেছি। আর তুমি মনের ভেতর প্রতিহিংসা, প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে নিজেকে আরো হিংস্র

এবং বর্বর করেছ। তোমার কোন অনুশীলন নেই। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি পারবে কেন? তোমাকে আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভয় করব কেন? তুমি আমার চেয়ে অধিক যোগ্য কিসে?

ভীম চিৎকার করে বলল: ভয় কর বলেই গুহায় লুকিয়েছ।

যুধিষ্ঠিরও তারসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল: তুমি যে গুহাতে আছ, এটা জানাতে তোমার কি হয়েছিল? তুমি তো ভয় পাও না। কিছু পরোয়া কর না। লঘু-গুরু মান না। তোয়াজ করতেও জান না। হঠাৎ এমন কি হলো যে, সব কথা হজম করে একেবারে সুবোধ বালক হয়ে গেছ। এরকম আচরণ তোমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে জানা ছিল না তো। তুমি এত ভালো ছেলে হলে কবে? তোমার মতো বীরপুঙ্গবের তো এভাবে লুকিয়ে থাকা মানায় না।

দুর্যোধন একটা চাপা হুংকার দিয়ে বলল: যুধিষ্ঠির ব্যঙ্গ করতে তুমিও পার তা-হলে। এই আঠারো দিনে তোমার স্বভাব, আচরণ আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে। এই বদলানোটা হয়ত আসল তুমি। জীবনই বোধ হয় মানুষকে বদলে দেয়। ভুলে যেও না, শক্ত হবার, নিষ্ঠুর হবার, স্বার্থপর হবার সময়, নিজের দিকে চাইবার সময় সব মানুষের জীবনেই আসে। এখন তোমার পালা এসেছে। তাই আগের মতো আর নেই। বদলে গেছ অনেক। একটা মানুষের আমূল বদলে যাওয়ায় পক্ষে একটা রাতই যথেষ্ট। নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছি।

যুধিষ্ঠির বলল: তুমি এত নিস্পৃহ হলে কবে? যে মান নিয়ে তুমি কুরুকুল, সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল এবং বীর যোদ্ধাদের মৃত্যু মুখে পাঠিয়েছ সেই দর্প, অহংকার তোমার কোথায় গেল? তোমার সেই দুর্জয় মানের মুখে ছাই দিয়ে গুহাবাসী জন্তুর মতো আঁধারে লুকোলে কেন? চুপিসারে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে তুমি নিজেকে ছোট করেছ। তোমার সম্মান, গৌরব তাতে কমল বৈ বাড়ল না।

দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে ভীম বলল: তোমার মতো ভীরু, কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক, লোভী, স্বার্থপর মানুষেরা এই পৃথিবীটাকে নোংরা করে দিচ্ছে। এই সুন্দর পৃথিবীতে তোমার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। পালিয়ে তুমি রেহাই পাবে

না। বেরিয়ে এস।

আহত বাঘের মতো দুর্যোধন খেপে গেল। রাগে আর নিরুপায় অসহায়তায় তার মুখখানা কুৎসিৎ হয়ে উঠল। কথা বলার সময় গলার শিরাটা ফুলে উঠল। বলল ঃ কে বলল, আমি পালিয়েছি? পালানোর মনোভাব থাকলে সাড়া দিতাম না। সকলের চোখের আড়ালে, একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম নিচ্ছি। একটানা আঠারো দিন ধরে যুদ্ধ করে আমি ক্লান্ত। ভীষণ ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত। তোমরা কি আমায় একটু বিশ্রাম করতেও দেবে না? আমি তোমাদের কী করেছি? আমাকে একটু একা থাকতে দাও। বিশ্রাম করা হয়ে গেলে বেরিয়ে আসব। আমার মতো তোমরাও পরিশ্রান্ত। তোমরাও বিশ্রাম কর গিয়ে। যুদ্ধ তো আর ফুরোচ্ছে না। তবে এত তাড়া কিসে?

গলার স্বর উচ্চগ্রামে পাঠিয়ে ভীম বলল ঃ আমাদের বিশ্রাম নেয়া হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার হয়নি। আমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর তাহলে। তারপর আশ মিটিয়ে যুদ্ধ করা যাবে। তোমরা কপটতা করে আমাকে হারিয়েছ। ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়কে কপটতা করে নির্মূল করেছ। তোমাদের কি আমি ক্ষমা করতে পারি? আমার বুকে স্বজন হারানোর চিতা জ্বলছে। তাদের মৃত্যু বেদনায় মনটা কাতরাচ্ছে। বুকে আমার শোকের সাগর উথাল পাথাল করছে। এই অস্থিরতা নিয়ে এখনই যুদ্ধ করতে পারছি না। শুধু একটু সময় নিচ্ছি।

যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ বলল ঃ তা কি করে হয়? তুমি এখন ভাই নও আর, আমাদের শত্রু। দয়া, অনুগ্রহ, করুণা শত্রুকে করে না কেউ। শত্রু দুর্বল থাকতে থাকতে তাকে আক্রমণ করে নির্মূল করাই বিধি। তোমাকে ধ্বংস করার এমন সুসময় তো আমি নষ্ট করতে পারি না। সময়ের কাজ সময়ে না করলে নির্বুদ্ধিতার খেসারত দিতে হয়। আমি সে ভুল করব কেন? এখন যুদ্ধের সময় হয়েছে, তুমি তোমার বল প্রদর্শন কর।

যুধিষ্ঠির, তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করব। তার আগে যাঁরা আমার হয়ে যুদ্ধ করেছে, নিঃস্বার্থভাবে প্রাণ দিয়েছে তাঁদের ঋণ

আমাকে পরিশোধ করতেই হবে। তার আগে কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ বাকি আছে। নিহতদের জন্যে আমি যমুনায় তর্পন করব। সমস্ত তীর্থ পর্যটন করে আচার্য বলরাম সেখানে আসবেন। তাঁকে শেষবারের মতো প্রণাম করব। আশীর্বাদ নেব। তারপর আমার সমস্ত পুণ্য কর্ম আর পরাক্রম নিয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তোমরা আমার চিরশত্রু। কী করে তোমাদের ক্ষমা করব? তোমাদের বধ করে হয় শান্তি পাব, না হলে সুহৃদরা যে লোকে গেছে, সেই লোকে যাব।

দুর্যোধন এটা তোমার রাজসভা নয়। তোমার বক্তৃতা শোনার লোকও এখানে নেই। ওসব বাকচাতুরীতে আমি ভুলছি না। শত্রুর শেষ রাখতে চাই না। তুমি বেরিয়ে এস।

দুর্যোধনের বেশ একটু অবাক লাগল। যুধিষ্ঠির তো এত নির্দয় নয়। তার ভেতর ক্ষমাশীল, মহাপ্রাণ সেই মানুষটাকে কোন নির্বাসনে পাঠাল? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সেই মহাত্মা নিহত হয়েছে কি? যুদ্ধে দ্রুত বদলে যায় মানুষের সম্পর্ক, ধর্ম-নীতি, মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব সব অন্যরকম হয়ে যায়। মানুষ অমানুষ হয়। যুধিষ্ঠির বোধ হয় আর মানুষ নেই। তার চোখে সে আর মানুষ নয়, শুধুই শত্রু। শত্রু কি মানুষ নয়? জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট জীব বলে ভাবা হয় তাকে। শত্রুর প্রতি একটু মানবিক সহানুভূতিও দেখাতে নেই। আচড়ে, কামড়ে, ছিন্নভিন্ন করে হিংস্র আক্রোশ মেটানোর একটা বস্তু যেন। শত্রুতা মানে পাশবিকতা। নির্দয়ভাবে বীভৎস কিছু করা। দুর্যোধনের ভীষণ কষ্ট হলো।

পাণ্ডবদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোনদিন ভালো ছিল না। তারা ছিল কৌরবদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিপক্ষ। বিদ্বেষ আর রেষারেষিতে তপ্ত হয়ে উঠেছিল তাদের সম্পর্ক। কিন্তু তা কখনও শত্রুতার মতো নির্দয় কিংবা হিংসাত্মক হয়ে উঠেনি।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির এবং সে পরস্পরের শত্রু। শত্রুকে কৃপা-অনুগ্রহ করে না কেউ। সবাই শত্রু এবং শত্রুতার ধ্বংস চায়। যুধিষ্ঠির খাপ খোলা তলোয়ার নিয়ে যেন খুঁজছে তাকে। রাতের শ্বাপদ যেমন তার নির্দিষ্ট শিকার খুঁজে বেড়ায় ঠিক তেমনি। যুধিষ্ঠির আর হিংস্র শ্বাপদের ভেতর কোন তফাৎ নেই। জয়ের

নেশায় এখন সে পাগল। রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর। তাকে নিশ্চিহ্ন করাই যুধিষ্ঠিরের শেষ লক্ষ্য। অন্য কথা শোনায় তার মন নেই।

দুর্যোধন ক্ষুব্ধ আক্রোশে অসহায়ভাবে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল: অর্জুন ছাড়া আর সকলের সঙ্গে আমি মুখোমুখি লড়েছি। কিন্তু তোমরা কেউ আমার বিক্রমের সামনে দাঁড়াতে পারনি। সে কথা এর মধ্যে ভুলে গেলে? তোমাকে জীবিত রাখা আমার ভুল হয়েছে। আরো একবার পণ রেখে দ্যুতক্রীড়া করব বলে তোমায় হত্যা করিনি। কর্ণও তোমাকে বন্দী করে; কেন যে মুক্ত করে দিল সেই জানে। তবে কাজটা সে ভালো করেনি, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বিশ্বাসভঙ্গ আমার সঙ্গে করেনি কে? পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মাতুল শল্য মায়াবশে তোমাদের আঘাত করেনি, করুণা করেছে। তাদের করুণায় তোমরা জীবিত আছ। তাই নিয়ে বীরত্বের গর্ব, আস্ফালন করা তোমার শোভা পায় না। এঁরা যুদ্ধে যদি তাঁদের কর্তব্য পালন করতেন, কোন রকম দুর্বলতা না দেখাতেন তা-হলে এভাবে আমাকে হারতে হতো না। তুমিও অপমান করার সুযোগ পেতে না।

কৃষ্ণ ইসারায় যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজক কথা বলতে বলল। যুধিষ্ঠির তাচ্ছিল্য করে বলল: দুর্যোধন এসব বাজে কথার কোন দাম নেই। যুদ্ধে কে কি ভাবে জিতল সেটা কেউ দেখে না, মনেও রাখে না। যে জিতল লোকে বলে জয় হলো তার, আর যে পারল না সে হেরে গেল। তোমার মতো নির্বোধ আমি নই। শত্রুকে অল্প দলন করে কিংবা পীড়ন করে ছেড়ে দিলে তার পরিণতি যে কী ভয়ংকর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে সে শিক্ষা যদি কেউ না নিয়ে থাকে তা হলে তার মতো আহম্মক আর নেই। শত্রুকে ক্ষমা করাও বিপজ্জনক। তোমাকে করুণা করার কোন প্রশ্ন উঠে না। তুমি নিজেই নিজেকে রক্ষা কর। সংগ্রামে জিতলে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে তোমাকে জয়ী বলে মেনে নেব। রাজ্য, ঐশ্বর্য, সিংহাসন সব তোমার হবে।

দুর্যোধন লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: অমন রাজ্যে আমার দরকার নেই। সারাজীবন তো রাজ্য সিংহাসন ঐশ্বর্যের মধ্যে কাটল। ওর প্রতি আর মোহ নেই। কার জন্যে যুদ্ধ করব?

কে আছে আমার? যাদের জন্যে রাজ্য সিংহাসন চেয়েছিলাম আমার সেই ভায়েরা, বন্ধুরা, পুত্রেরা কেউ জীবিত নেই। কিসের প্রত্যাশায় রাজত্ব করব? বিধবার মতো বসুমতীকে ভোগ করার বাসনা আমার নেই। বাকি জীবনটা বৈরাগীর মতো কাটিয়ে দিতে পারব। রাজ্য-সিংহাসন প্রতিপত্তি লাভের জন্যে তোমরা অধর্ম যুদ্ধ করে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, ভগ্নীপতি জয়দ্রথ, বন্ধুবর কর্ণ এবং অগণিত বীরকুলকে ধ্বংস করে পৃথিবীকে মহাশ্মশান করেছ, সেই পৃথিবীতে তুমি একা নিজের মতো রাজত্ব কর। আমি তোমার রাজ্য ভোগের পথে কাঁটা হয়ে থাকব না। বনে চলে যাব। বুকে আমার অনেক তাপ জমেছে। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। যে রাজ্য প্রাণ থাকতে দিতে পারিনি আগে নির্দ্বিধায় তোমাকে তা অর্পণ করলাম।

যুধিষ্ঠিরের ভিতরটা হঠাৎ-ই কেমন হয়ে গেল। প্রশ্নয় ভরা সংশয়ে দুটি উজ্জ্বল চোখ ভরে কৃষ্ণের দিকে চেয়েছিল। যুধিষ্ঠির ভাবছিল দুর্যোধন মানুষ নয়, দস্যু। দস্যুর মতো শুধু লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু ওর ভেতরে যে সত্যিকারে একটা মানুষ আছে, বাইরের আবরণ সরিয়ে কোনদিন দেখা হয়নি তাকে। দুর্যোধনের জন্যে কষ্ট হলো, সহানুভূতি জাগল।

যুধিষ্ঠিরের আকস্মিক ভাবান্তরে কৃষ্ণ বেশ একটু বিচলিত হলো। মুখ চোখে তার বিহ্বল ভাব। যুধিষ্ঠিরের কেন যে এরকম রূপান্তর হয় ভেবে পায় না কৃষ্ণ। ভিতরে ভিতরে রাগে ফুঁসতে লাগল। নিজের রাগ সামলে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে আত্মসচেতন করতে বলল ঃ মানুষের মনটা এক গহন জঙ্গল। সেখানে অনেক চোর, ডাকাত, প্রতারক, বঞ্চক বাস করে। বাইরে থেকে তাদের চিনতে না পেরে যদি কেউ বিভ্রান্ত হয় তা'হলে তাদের হাত থেকে পাহারা দেয়ার কাজ কঠিন হয়। বেঁচে থাকার জন্যে, অস্তিত্ব রক্ষায় মানুষকে প্রতিমুহূর্ত নানারকম ছল-চাতুরী করতে হয়। এটা কোন অন্যায় নয়, অধর্মও নয়। বেঁচে থাকার জন্যে, জীবনে জেতার জন্যে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা কিংবা হারিয়ে দেওয়া মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার একটা প্রধান শর্ত। তোমার মতো বিবেকবান, ধর্মপ্রাণ, ভাবপ্রবণ মানুষকে

বিভ্রান্ত করার যে কূটনীতি দুর্যোধন নিয়েছে, তাতে ভুলে না গিয়ে উল্টে অপমান কর।

যুধিষ্ঠির কেমন একটা অসহায় দৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে তাকাল। দুর্যোধনকে কটু কথা বলতে কষ্ট হলো। কৃষ্ণ তার মনের অবস্থা বুঝে রাগত গলায় বলল: দুর্বলতা দেখানোর সময় অনেক পাবে। এখন কর্তব্য কর। শত্রুর সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করবে; তাতে দ্বিধা কেন?

যুধিষ্ঠির কলের পুতুলের মতো বিরক্তি প্রকাশ করে বলল: রাজ্য সিংহাসন ফিরিয়ে দেবার তুমি কে? এরাজ্য বাহুবলে আমরা জয় করেছি। যুদ্ধের আগে পাঁচখানা গ্রাম ভিক্ষে চেয়েছিলাম। সেই সামান্য দানটুকু যে করতে পারেনি সে হঠাৎ সাড়ম্বরে ভূদান করছে? মূর্খ, এ রাজ্যের উপর তোমরে অধিকার কি? অধিকার ফিরে পাওয়ার লড়াই যখন শুরু হয়েছে, তোমাকে হারিয়ে, নিশ্চিহ্ন করে আমি এ বসুন্ধরা ভোগ-দখল করব। বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দিতে যে পারেনি সে কোন স্পর্ধায় আমার অধিকৃত রাজ্য দিয়ে আমাকে করুণা করছে। কপটতা ছেড়ে গুহা থেকে বেরিয়ে যুদ্ধ কর। আমি তোমার কোন কথায় ভুলছি না। গুহা ছেড়ে বেরও শয়তান।

আমাকে এত ভয় পাও তুমি! বিশ্রাম পাছে আমাকে নবীকৃত করে, শরীরে বল ও উদ্যম সঞ্চার করে, যদি তুমি হেরে যাও—তাই এ অবকাশ তোমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ধিক্ তোমাকে যুধিষ্ঠির। তোমার বিবেককে হত্যা করেছ। বিবেক মরে গেলে আর কোন কষ্ট থাকে না। অনুশোচনা হয় না। তাই পিতামহকে, আচার্য দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, কর্ণকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘাতকের মতো হত্যা করেছ। সৎ যুদ্ধে নয় অন্যায় ভাবে আমাকে হত্যা করতে তুমি মরিয়া হয়েছে। তোমার সখা কৃষ্ণের মতো তুমি ও তোমার ভাইরা এক এক জন ঘাতক। তার পরামর্শেই তোমরা নিয়মহীন, নীতিহীন বীভৎস নরহত্যায় মেতে উঠেছ। পৃথিবীর মানুষ তোমাদের ক্ষমা করবে না। তোমরা করুণার অযোগ্য। ঘৃণার পাত্র।

দুর্যোধনের বাক্যে ভীম অসহিষ্ণু ক্রোধে আত্মহারা হলো।

শরীরটা তার রাগে, অপমানে কাঁপতে থাকে। কথা বলার সময় গলার শিরাগুলো ফুলে উঠল। দপ দপ করতে লাগল। ভীম তাচ্ছিল্য করে বলল : চমৎকার। তোর মতো শয়তানের মুখে কৃষ্ণ নিন্দা শোভা পায়। নরকের কৃমি, মনে নেই আমাদের সঙ্গে কি জঘন্য আচরণ করেছিস। বিষ খাইয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলি, জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করেছিলি। তোর মতো বর্বরই পারে ভ্রাতৃবধূকে অসম্মান করতে। তোর মতো ক্ষত্রকুলগ্লানির পক্ষেই সম্ভব শান্তির দূত কৃষ্ণকে বন্দীর চেষ্টা করা। তুই যদি প্রকৃতই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত সন্তান হোস্ তাহলে গুহা থেকে বেরিয়ে যুদ্ধ কর। ধর্মাত্মা গান্ধারীর সন্তান কাপুরুষের মতো লুকিয়ে থাকে না।

ভীমের বাপ-মা তুলে কথা বলাটা দুর্যোধন সহজ মনে মেনে নিল না। ভীষণ অপমান বোধ করল। ধৃতরাষ্ট্রের মতো বাবা পাওয়া ভাগ্যের কথা। শুধু তার সুখ ও শান্তির জন্যে, তার হাসিমুখ দেখার জন্যে : করেনি এমন কাজ নেই। পাণ্ডবেরা তো পিতাকে পায়নি কখনো. পিতার স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা বুঝবে কি করে ? পিতারা তাদের জন্মের কারণ, কিন্তু কোন দায়িত্ব, কর্তব্য করেনি তারা। পিতাদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই গড়ে উঠেনি। পিতার স্নেহের অভাবে তাদের বুকে হিংসার মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে শুধুই তৃষ্ণা, আর অতৃপ্তির কণ্ঠভরা জ্বালা। সুতরাং তাদের পক্ষে এ ধরনের কথা ভাবা স্বাভাবিক।

তথাপি, ভীমের কথাগুলো তার কটু লাগল। রাগে ভেতরটা তেতে উঠল। অপমানে কান জ্বালা করতে লাগল। বুকটা তোলপাড় করল। কষ্টবিদ্ধ অপমানে জননীর মুখখানি দেখল। কৌরব পরিবারে গান্ধারীর একটা ভিন্নতা আছে। তার মতো মা ক'জন পায় ? অমনি একটা খুশি আর গৌরব বোধ জাগে তার ভেতর। মাতার অপমানকারীর উপর তার মনটা বিরূপ হলো। ঘৃণায় ভেতরটা অস্থির হলো। অপমানটা এত গভীরভাবে মনে বাজল যে সব ভয় কেটে গেল। একটা দুরন্ত প্রতিবাদে তার বুক তোলপাড় করল। বলল : ভীম, লঘু-গুরু মাত্রাবোধটা তোমার মধ্যে নেই। আমাদের কথা কাটাকাটি, বিবাদের সঙ্গে আমার অন্ধ

পিতা এবং ধর্মপ্রাণ পতিব্রতা জননীর কোন সম্পর্ক নেই। এর ভেতর তাঁদের টেনে এনে অপমান করার অধিকার তোমাকে দিল কে? কৈ, আমি তো একবারও বলিনি ছোট-মা ব্যাভিচারিনী। তোমরা কেউ এক পিতার সন্তান নও।

ভীম শুধু নয় পঞ্চপাণ্ডব সরোষে দাঁতে দাঁত দিয়ে একসঙ্গে গগনভেদী চিৎকার করে উঠল ঃ দুর্যোধন। তোমার জিভ আমরা ছিঁড়ে ফেলব।

দুর্যোধন কিছুমাত্র ভীত না হয়ে বলল ঃ কটু ভাষায় তোমাদের গালমন্দ ভৎর্সনা, তিরস্কার সত্ত্বেও ভ্রম বশে উচ্চারণ করেনি তোমরা অবৈধ জারজ সন্তান।

পঞ্চ পাণ্ডবের উন্মত্ত ক্রুদ্ধ তর্জন গর্জন, তিরস্কারের ভেতর দুর্যোধন বলতে লাগল—বলিনি, সমাজের কলঙ্ক তোমরা। কৌরবংশের লজ্জা। হস্তিনাপুরে দস্যুর মতো ঢুকে পড়েছ।

চিৎকার, চেঁচামেচি, গণ্ডগোলের ভেতর দুর্যোধনের কথাগুলো পাণ্ডবেরা কতটা শুনল আর শুনল না—তারাই জানে। হিংস্র রাগে ভীম নিষ্করুণ, কঠিন এক পুরুষ। নির্মম তিরস্কারের ভাষায় তার রাগের নিষ্ঠুর প্রকাশ ঘটল। বলল ঃ মূর্খ, দুরাত্মা, তোর পাপমুখ দেখতে আমার ঘেন্না করছে। একদিন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে কুকথা বলে অসম্মান করেছিলি। আজ যে মুখে তুই মাকে অসম্মান করলি, সেই মুখ আমি পদাঘাতে চূর্ণ করব। তুই শুধু বেরিয়ে আয়। তোকে আমি ছিঁড়ে ফেলব। তোর নিরানব্বই ভাইকে হত্যা করেছি। বাকি শুধু তুই। আমার বুকে ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসার দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে আগুনে তোর আহুতি না হওয়া পর্যন্ত আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হবে না। আমি গ্লানিমুক্ত হব না।

অন্ধকারের মধ্যে নির্বাক মার খাওয়া মানুষের মতো অপমান সহ্য করে চুপচাপ লুকিয়ে থাকতে দুর্যোধনেরও ভালো লাগল না। মনে হলো, সে একাই কেবল ভয়ে সিঁদিয়ে আছে গুহার মধ্যে। এই এক জায়গায় অনন্তকাল ধরে বসে থাকলেও তার মুক্তি নেই। কথাটা দুর্যোধনকে চমকে দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ যেন বুঝিয়ে দিল, ব্যক্তির ছোট্ট ঘেরাটোপের জগৎ থেকে যে বেরিয়ে আসতে না

পারে তার নিজের বাঁচার অধিকার অন্যের হাতে বাঁধা দিতে হয়। নিরুপায় হয়েই। এই উপলব্ধিতে সে শিহরিত হলো। আর তখনই গান্ধারীর কথাগুলো খুব বেশি করে মনে হলো।

পুত্র, যে সমস্ত বিরুদ্ধতাকে জয় করতে পারে ; সমস্ত প্রতিকূলতাকে নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে নিতে পারে—যুদ্ধে জয় হয় তার। সব বাবা-মা চায় সন্তান জয়ী হোক। কিন্তু তুমি যদি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে না পার, তা-হলে তোমার অন্ধ পিতা যত আগলে রাখুক, তারও সাধ্য নেই বহির্বিশ্বের নানাবিধ আক্রমণ থেকে তোমাকে রক্ষা করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটা উপলক্ষ্য। শরীর ও মনকে একযোগে তার জন্যে তৈরী করতে হয়। প্রতিপক্ষকে হারানো যখন লক্ষ্য হবে তখন তোমার সমস্ত আবেগ, উদ্যোগ এবং মনের একাগ্রতাকে লক্ষ্যাভিমুখী করতে যদি ব্যর্থ হও তোমার সারাজীবনের সাধনা, অধ্যবসায় পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। ক্লান্তি আসবে, ভয় হবে। পুত্র, কোন সৎ উদ্যোগই ব্যর্থ হয় না, যদি নিজ থেকে ব্যর্থ না করে সে।

দুর্যোধনের ভেতরটা এক আশ্চর্য বিস্ময়ে চমকিত হতে লাগল। জননীর অন্তর্দৃষ্টি হয়তো ভবিষ্যতের ছবিটা দেখতে পেয়ে তাকে সতর্ক করেছিল। কথাগুলো তারই জীবনে যে এমন করে ফলে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি।

জননীর আদেশের মতো কথাগুলো তার বুকে স্পন্দিত হতে লাগল। অন্তরটা জ্যোতির্ময় হলো। ভয় ভাবটা দূর হলো। আস্তে আস্তে তার ভিতরটা কঠিন হচ্ছিল। দানা বাঁধছিল প্রতিরোধ। পায়ের নিচে মৃদু একটা কম্পন টের পাচ্ছিল। সেটা রাগের নয়। শরীরে ভেতর কিসের একটা অপ্রতিরোধ্য আলোড়ন তাকে স্থির থাকতে দিল না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি তার নেই। সে যেন এক অদৃশ্য শক্তির টানে গুহা থেকে বাইরে এল।

খাড়াই সিঁড়ি ধরে উঠার সময় গত রাতের কথা মনে পড়ল। পাছে দেখে ফেলে কেউ, জেনে যায় তার গোপন আস্তানা তাই বিপদের ভয়ে আচার্য কৃপ, বন্ধু অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মার ডাকে সাড়া দেয়নি। তবু সেই বিপদেই পড়ল। সাবধানে থেকেও এড়াতে পারল না। যা ঘটবার সব ঘটে যাচ্ছে, তার যেন কিছু করার নেই।

বড়ই হতভাগ্য, জীবনের কোন কিছুই সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বন্ধুরা বিপদের পাহারাদার হয়ে এসেছিল। তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকলে যে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পেত, তাও নয়। বোধ হয়, মানুষ ইচ্ছে করলে সব সময় সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। পাণ্ডবদের সঙ্গে তার যুদ্ধটা তাতে বন্ধ হতো না। বরং একটা বড় আকার নিত। কিন্তু এমন একা লড়াই করতে হতো না। সেটা সত্যিকারে যুদ্ধ হতো। হয়তো কৌরব পাণ্ডবের আমৃত্যু শেষ যুদ্ধ।

ঘটনার উপরে মানুষের যখন হাত থাকে না তখন তা নিয়ে ভেবে মানুষ মন খারাপ করে কেন? মনেতেই যত আবেগ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দুর্যোধন খাড়াই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল আর কেমন একটা আত্মপ্রত্যয়ে তার ভেতরটা ভরন্ত কলসের মতো ভরে যেতে লাগল। নিজের মনে বিড় বিড় করল: জিতব, জিতব। যুদ্ধে আমি কোন অধর্ম করিনি, পাপ করিনি, কপটতার আশ্রয় নিই নি। আমি হেরে গেলে মাতৃবাক্য: 'যথা ধর্ম তথা জয়' মিথ্যে হয়ে যাবে। অধর্মের সঙ্গে ধর্মের যে সংঘাত বেঁধেছে তার বিজয় পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করতেই যেন জয়লক্ষ্মী হাত ধরে গুহা থেকে আমায় টেনে আনছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে পালিয়ে আসে, সে তো আর একদিন যুদ্ধ করার জন্যে বেঁচে থাকে। কিন্তু সে যুদ্ধ কবে শুরু হবে কেউ জানে না। জয়লক্ষ্মী সেই নাটকের উপর এক্ষুনি যবনিকা টেনে দিচ্ছে।

দুর্যোধনের মুখে প্রসন্ন আস্বস্তির আভা ফুটে উঠল। একটা হাল্কা ভারমুক্ত আনন্দ তার শরীর মনকে চাঙ্গা করে তুলল।

সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে এখন হেমন্তের নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের রৌদ্র ঝলমলে শান্ত নীল আকাশ উজ্জ্বলতায় আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। মাকড়সা গাছের ডালে জাল বুনছে। সুড়ঙ্গের দেওয়ালে একটা বড় টিকটিকি কপ্ করে একটা পতঙ্গ ধরল আর পাথরের গায়ে ঝাপ্টাতে লাগল পাশবিক আনন্দে। অনেক দূর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল। কাছাকাছি কোথাও একটা বনমোরগ তারস্বরে ডাকছিল। কাকে ডাকছে, কেন ডাকছে—কে জানে? দুর্যোধন কৌতুকবোধ করল। এই মুহূর্তে অনুভূতিতে যা চমৎকার লাগছে, হয়তো

কিছুক্ষণ পরেই তা অন্যরূপে, অন্যভাবে প্রতিভাত হবে। মানুষের মনের অয়নপথ বড় বিচিত্র। মানুষ নিজেও বোধহয় তার গতি-বিধির খোঁজ রাখে না।

সুড়ঙ্গের বহির্মুখে পঞ্চপাণ্ডবসহ পাঞ্চালেরা এবং সখা কৃষ্ণকে দেখতে পেল। সকলেই চেয়ে আছে তার দিকে। তাদের চাহনি যেন ব্যঙ্গ করছে, অধরের স্মিত হাসি যেন উপহাস করছে। বুক কেঁপে উঠল দুর্যোধনের। ভয়ে নয়, পরাজয়ের বিভীষিকায়।

দুর্যোধনের নাকের নিঃশ্বাস উষ্ণ হয়ে উঠল। দু'চোখের তারা স্পন্দিত হতে লাগল। উত্তেজনায় বুক দ্রুত উঠানামা করতে লাগল। সবুজ লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে বাঘ যেমন শিকারের গন্ধ পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ছুটে যায়, তেমনিভাবে দুর্যোধন গুহা থেকে বাইরে পা রাখল নিয়তির নির্দেশে।

অনেকখানি খাড়াই পথ উঠে এসে দুর্যোধন ক্লান্ত হয়ে খানিক দাঁড়াল। দম নিয়ে বলল ঃ বৃকোদর অনেক লম্বা চওড়া কথা বলছ। তুমি কি ভাব নিজেকে? দুর্যোধন মরেনি। কেবল, রণক্লান্ত, ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত। এই অবস্থায় আমাকে পরাভূত করা সহজ। কিন্তু যে বীর, সে ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্তকে আহার ও পানীয় দিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তুমি আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের কোন ব্যবস্থা না করেই স্পর্ধা দেখাচ্ছ। আস্ফালন করছ। আহার ও বিশ্রামের পরে আমি অবশ্যই তোমার যুদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ করব। দুর্যোধন ভীরু, কাপুরুষ নয়। গদা, দুর্যোধনের বল এবং পৌরুষ। গদা থাকতে কারো সাধ্য নেই দুর্যোধনকে পরাভূত করে মিছিমিছি চেঁচিয়ে শক্তি ক্ষয় করছ।

কৃষ্ণ ব্যঙ্গ করে বলল ঃ চমৎকার! আবার এক নতুন নাটক শুরু করলে?

দুর্যোধনের ভুরু কুঁচকে গেল। বলল ঃ নাটক! নাটক তো তোমরা করছ। তোমাদের কোন কাজটা নাটকীয় নয়? তুমি হলে দক্ষ অভিনেতা এবং নাট্যপরিচালক। তোমার নির্দেশনায় পঞ্চপাণ্ডব ভালোই অভিনয় করছে। সেটা দেখার চোখ চাই! সকলের তো থাকে না, তাই তোমার পরিচালনার দক্ষতা ও কৃতিত্বকে তারা

দেখতে পাচ্ছে না। কখন কোন অবস্থায় কী করা দরকার, কোন পরিবেশে কোনটা সাজে, এবং প্রত্যেকটি মুহূর্ত কিভাবে সদ্ব্যবহার করলে গোটা নাটকটা জমে, তোমার পরিচালনায় তার কোন ফাঁকি নেই।

কৃষ্ণ হাসি হাসি মুখ করে বলল : চমৎকার!

দুর্যোধন বলল : আমিও বলি চমৎকার। বোকা দর্শকের আসনে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে দর্শকের মতো আমিও একাত্ম হয়ে গেছি। দেবকীনন্দন, পৃথিবীতে স্বার্থহীন মানুষ হয়? কিছু প্রত্যাশা না করেও মানুষের উপকারে যে লোক জীবন উৎসর্গ করল, তারও গোপন মনে সুনাম, খ্যাতি, জনপ্রিয় হওয়ার বাসনা থাকে। মাতার সন্তান স্নেহও স্বার্থে কলুষিত। তার দৃষ্টান্ত তো পাণ্ডু মহিষী কুন্তী।

ভীম সরোষে হুংকার দিল। দুর্যোধন! জননী সম্পর্কে অশ্রদ্ধার কথা উচ্চারণ করলে তোমার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

দুর্যোধনের অধরে কৌতুক হাসি। চোখে আগুন। বলল : ভ্রাতা, ধীরে। কর্ণের যে অনুগ্রহ, দয়া নিয়ে তোমরা পাঁচ ভাই বেঁচে আছ, সে কথা শুধু কৃষ্ণ জানে। মাতা-পুত্রকে নিয়ে কর্ণ-কুন্তী সংবাদের মতো এক সুন্দর নাটকের স্রষ্টা কৃষ্ণ। ভীম, কর্ণ তোমার সহোদর। কুমারীত্বের কলঙ্ক মুছে ফেলতে কুন্তী বিসর্জন দিল কর্ণকে। সন্তান বলে যাকে স্বীকার করল না তার কাছেই সন্তানের দাবিতে, জননীর অধিকারে পঞ্চ-পাণ্ডবের জীবন ভিক্ষা চাইল। একটু সরম হলো না কুন্তীর। এর মতো নাটক হয়? জননীর ভূমিকায় কুন্তীর কী সুন্দর অভিনয়! কী আশ্চর্য অনুশোচনার ছলনায় কর্ণের কঠিন মনকে চোখের জলে ভিজিয়ে একটু একটু করে গলিয়ে পিচ্ছিল করে দিল। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত কর্ণের সাধ্য কি পিচ্ছিল মাটিতে পা রাখে? অর্জুন ছাড়া অন্য পাণ্ডবেব জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কুন্তী ঘরে ফিরল। কিন্তু কর্ণের প্রাণরক্ষার কোন অঙ্গীকার করল না। কুন্তীর জননী হৃদয়ে কর্ণের জন্যে একটু করুণা কিংবা মমতা নেই। কেবল মমতার অভিনয় করল। সন্তানের সঙ্গে জননীর এমন অভিনয় পৃথিবীর

ক'জন জননী করে? নাটকের চরম মুহূর্তে কতরকম প্রলোভন, কত আশ্বাস দিল। কিন্তু নিরুপায় অসহায় কর্ণ দুর্দিনে বিশ্বস্ত বন্ধু দুর্যোধনকে কোন কিছুর বিনিময়ে ত্যাগ করল না। তাই, তার কাছ থেকে অর্জুন বধের মারাত্মক অস্ত্রটি কেড়ে নেয়ার জন্যে ঘটোৎকচকে দিয়ে আবার এক নাটক করল কৃষ্ণ। কর্ণকে নিঃস্ব রিক্ত নিরস্ত্র করে অর্জুনকে দিয়ে হত্যা করে সেই নাটকের যবনিকাপাত করল। একটু থেমে বলল ঃ কৃষ্ণ নীরব কেন? জবাব দাও। কোন স্বার্থে একজন জননী তার আর এক গর্ভস্থ সন্তানের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর অমানবিক ছলনা করল? এ কি খুব দরকার ছিল, কৃষ্ণ? কর্ণ তোমার তো কোন ক্ষতি করেনি। তবু সহোদর ভ্রাতাকে দিয়ে তাকে হত্যা করার এই নিষ্ঠুর নাটক করলে কেন?

কৃষ্ণ তার বিব্রতভাবটি কাটিয়ে উঠার জন্যেই মুচকি হাসল। তাচ্ছিল্যের হাসি। বলল ঃ দুর্যোধন, আমি মুগ্ধ হয়ে তোমার নাটক শুনছিলাম। তোমার উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা করি। আমার ও পাণ্ডু মহিষী কুন্তী চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে তুমি নিজেকে ছোট করলে। মানুষকে অপমান করাই তোমার স্বভাব।

দুর্যোধন মরিয়া হয়ে বলল ঃ চমৎকার। কত রকমের ছলনাই তুমি জান। পাণ্ডবদের জন্যে যা করেছ তা স্বার্থহীন নয়। তাদের কাঁধে অস্ত্র রেখে তুমি বিশ্বাধিপতি হতে চাও। তোমার রূপরেখা এত নিখুঁত যে কোথাও ফাঁক নেই। তোমার চাতুরী ধরার ক্ষমতা পাণ্ডবদের নেই। তারা জানে না এ মহাযুদ্ধের নায়ক তুমি। যুদ্ধটা তোমার নিজের জন্যে। কিন্তু নিজে তুমি যুদ্ধে লিপ্ত নও। তুমি সম্মুখযোদ্ধা নও, একজন দর্শক মাত্র। তাই তোমার গায়ে অস্ত্রের আঁচড় লাগল না। বীরেরা যখন বর্শা ছোঁড়ে, তরোয়াল ঘোরায়, বাণ মারে, তখন তুমি তক্কে তক্কে থাক। দূর থেকে অর্জুনের ধনুকের ছিলায় বাণ জুড়তে বল আর নির্ভুল লক্ষ্যে এক একটি শত্রুপক্ষের বীরকে ঘায়েল কর। শত্রুনিপাতের সফলতম নায়ক তুমি। এই মহাযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বীরদের ঘাতক তুমি। তোমার প্ররোচনায় ও পরামর্শে তারা নিহত। ক্ষাত্রকুলের কলঙ্ক তুমি। ধিক্ তোমার কূট রণনীতি। এখন আমার মৃত্যু চাও তুমি। আমাকে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত জেনেও রণে আহ্বান করছ। এর চেয়ে

জঘন্য মানবিকতাবিরোধী অপরাধ আর নেই। মানুষ হলেই তার কতকগুলো মানবিক দিক থাকে। কিন্তু তোমার ভেতর তার প্রকাশ কোথায়? তুমি রক্ত মাংসের পাষাণ মানুষ। তুমি আমার সব কেড়ে নিয়েছ। এখন বাকি শুধু আমি।

দুর্যোধনের কথায় হাসল কৃষ্ণ। অনাবিল প্রসন্নতার হাসি। বলল ঃ তোমার রাগ পড়েছে। ভেতরে জমানো তাপ ঠাণ্ডা হয়েছে তো? আর কিছু বলবে? তোমার ভয় হচ্ছে না।

কৃষ্ণের রসিকতা কানে খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধল দুর্যোধনের। ঢোঁক গিলে বলল ঃ ভয় হবে কেন? ব্যঙ্গ করছ?

কৃষ্ণের মুখে আবার হাসি ঝরল। তার চোখে চোখ রেখে হাসল মুখ টিপে। বলল ঃ খাঁচায় সিংহকে চোখের সামনে দেখে কে না মজা করে? কতরকম টিপ্পনী কাটে তখন।

দুর্যোধনের কানের পাশ দুটো দপদপ করছে, মাথার ভেতর একটা যন্ত্রণা নড়াচড়া করছে। কী করবে সে? তার করার কি আছে? হিংস্র ক্রোধের তাপে গনগন করছে তার মুখ। দুই চোখে ঘৃণাভরা অসহায় আক্রোশ নিয়ে কৃষ্ণের দিকে তাকাল। কোন উত্তর করল না। করে, কী লাভ? প্রবাদ আছে হাতি হাবরে পড়লে ব্যাঙেও চাট্‌ মারে। এ তার নিয়তি।

অনুভূতিশূন্য মূর্তির মতো দুর্যোধন তাকাল যুধিষ্ঠিরের দিকে। সে চাহনির ভেতর এমন কিছু ছিল যা দেখে যুধিষ্ঠিরের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। দুর্যোধনের এমন পাথর মূর্তি আর বোধ হয় দেখেনি। তার পাশে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির।

দুর্যোধনের আকস্মিক আবিভাবে সে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। সমস্ত চিন্তাশক্তি কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় ঠিক অনুমান করতে পারছিল না প্রকৃতই কী হতে পারে? তবে কৃষ্ণ যে একটা কিছু ঘটাতে চলেছে এ শুধু তার ভূমিকা। দুর্যোধনের লম্বা চওড়া কথাবার্তায় সে একটু ক্ষুব্ধই হয়েছিল। মনে হলো, চুপ করে থাকাটা তার ঠিক হচ্ছে না। কিছু একটা বলা দরকার। না ভেবেই বলল ঃ আমাদের পাঁচ ভাইর সঙ্গে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে না। পাঁচজনের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তুমি যুদ্ধে আহ্বান কর। সেই যুদ্ধে পরাজিত হলে আমরা

তোমার অধীনতা মেনে নেব।

যুধিষ্ঠিরের কথায় কৃষ্ণ চমকে তাকাল দুর্যোধনের দিকে। এরকম একটা বেফাঁস কথা যুধিষ্ঠির যে হঠাৎ বলবে ভাবেনি কৃষ্ণ। তাই দুর্যোধন কিছু বলার আগেই কথাটা শুধরে নেয়ার জন্যে বলল ঃ ধর্মরাজ, দুর্যোধন ক্লান্ত হতে পারে, তার বলবিক্রম দেখানোর মতো অবস্থাও এখন নয়। তবু তার বীর্যকে অবহেলা করার নয়। তার শক্তিকে তাচ্ছিল্য করা তোমার ভীষণ অন্যায় হয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য সম্মান না দিলে নিজেকে ছোট করা হয়। সত্যি কথা বলতে কি, দুর্যোধনের সমকক্ষ বীর যোদ্ধা তোমাদের পাঁচজনের মধ্যে ভীম ছাড়া কেউ নেই। দুর্যোধন গদা হাতে করলে কারো সাধ্য নেই সামনে দাঁড়ায়। তার গদার আঘাতে তোমরা রেণু রেণু হয়ে যাবে। দুর্যোধনের অনেক দিনের সাধ ভীমের সঙ্গে আশ মিটিয়ে যুদ্ধ করার। বীরকে তার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দিলে তবেই তার প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানো হয়। তোমার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়ে তাকে শুধু ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বল।

দেবদারু গাছের মগডালে গোলাপি গলার জঙ্গুলে শকুনটা কর্কশ গলায় বিশ্রীভাবে ডাকল। দ্বৈপায়ন হ্রদের চারপাশে নিটোল স্তব্ধতাকে যেন ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিল। তার বিকট অলক্ষুণে ডাকে দুর্যোধনের ভেতরটা চমকে গেল, মনটা খারাপ হলো। বুকের ভেতরটা ত্রাসে শুকিয়ে গেল। শকুনের ডাক আগেই অমঙ্গলের বার্তা বহন করে আনল যেন। কিন্তু তার নিভৃত মনের নীরব প্রতিক্রিয়া, তার অমঙ্গল আশংকা কথা বলবে কাকে? কি করে বা বোঝাবে? নিজের উদ্বেগ, অস্থিরতা চট করে লুকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, দেবকী নন্দন, তুমি আমার ভাগ্যের ছকটাকে উল্টে দিলে। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাকে খুশি বেছে নেয়ার অধিকার খর্ব করে আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে। আমি তোমার কি করেছি? আমার উপর এত রাগ কেন?

কৃষ্ণের মুখে নিষ্ঠুর হিংস্র হাসি ফুটে উঠার আগে সামলে নিয়ে সহজ কৌতুকেই তাকাল তার দিকে। বলল : তোমার ভয়টা কিসের? ভীমকে তো তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। গদা

যুদ্ধে তুমি তো চিরদিন তার সঙ্গে লড়াই করতে খুব পছন্দ কর।

দুর্যোধনের অহংকারে আঘাত লাগল। চোখের তারায় চকিতে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। বলল্ঃ ভয় ভীমকে নয়। ভয় তোমার শত্রুতাকে। যুদ্ধে জেতার জন্যে কোন যুদ্ধনীতিই তুমি মান না। রণক্লান্ত পিতামহ একটু বিশ্রামের জন্যে অস্ত্রত্যাগ করে সময় চাইল, তুমি সেই সময় দাওনি তাঁকে। পিতামহের বড় আদরের অর্জুনের হাত দিয়ে মৃত্যুবাণ পাঠালে। চাতুরী করে আচার্য দ্রোণকে অশ্বত্থামার মিথ্যে মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে হঠাৎই অভিভূত করলে। শোকে মুহ্যমান আচার্য অস্ত্র ত্যাগ করে নির্বাক পাথরের মূর্তির মতো যখন রথে বসেছিল পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার নির্দেশে তাঁকে ছিন্নমুণ্ড করল। জয়দ্রথকেও কপট কৌশলের ফাঁদে ফেলে হত্যা করলে। ভগ্নরথের চাকা বদলানোর কাজে ব্যস্ত নিরস্ত্র কর্ণের উপর বাণ বর্ষণের জন্যে অর্জুনকে প্ররোচিত করেছিলে। ভারত বিখ্যাত গদা যোদ্ধা মহারাজ জরাসন্ধ ভীমের মতো সামান্য একজন যোদ্ধার হাতে নিহত হলো তোমার কপটতায়। ভীমকে যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করতে তুমিই ইশারা করে-ছিলে। পাণ্ডবেরা তোমার সমস্ত অধর্ম এবং দুষ্কর্মের সাক্ষী। তোমার মতো দুষ্কৃতকারী, কপটাচারীর উপস্থিতিতে ভীম ও আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হচ্ছে বলেই একটা খারাপ কিছু আশঙ্কা করছি। একটা দুষ্টবুদ্ধি নিয়ে ভীমের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে বলেছ, সেটা ভেবেই শঙ্কা অনুভব করছি। কারণ, আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে তুমি দায়ী। শেষ যুদ্ধটা যুদ্ধনীতি মেনে করার অনুরোধ করব। দুর্যোধন ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়। যুদ্ধে দুর্যোধন কপটতা করেনি, অধর্ম করেনি, মিথ্যে বলেনি। তোমার কাছে শুধু সেটাই প্রত্যাশা করি। এটাই তোমার কাছে আমার একমাত্র চাওয়া।

কৃষ্ণের অধরে বঙ্কিম হাসি বিস্ফারিত হলো।

যুদ্ধ শুরু হলো। ভীম ও দুর্যোধনের আক্রমণ সমান ক্ষিপ্র। গদা কামড়ে দু'জন লড়াই করছিল। এ যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কথা মনে রেখেই দুর্যোধন গদা চালাচ্ছিল। দু'জন দুজনকেই

কাবু করতে চাইছে। দুটি হিংস্র চোখে দু'জনে দুজনকে অনুসরণ করছে। কিন্তু কেউ কাউকে কব্জা করতে পারছে না।

বলিষ্ঠ দু'হাতে গদা আঁকড়ে ধরে, দুজনেই আক্রমণ করার জন্যে চোখে চোখ রেখে পাক খাচ্ছে। কখনও বা শূন্যে লাফ দিয়ে গদার আঘাত সামলে নিচ্ছে।

দুর্যোধনের শরীর নয়, যেন পেটা লোহা। ভীমের গদা সজোরে দুর্যোধনের পিঠে পড়ল। গদাই ছিটকে গেল। মরণ-বাঁচন লড়াই। দুর্যোধন ক্ষুধা, তৃষ্ণার জ্বালা ভুলে গেছে। ভীমকে হত্যা করতে পারলে যুধিষ্ঠিরের প্রতিশ্রুতিমতো সে হস্তিনাপুর রাজ্য এবং সিংহাসন ফিরে পাবে। পঞ্চপাণ্ডব তার অধীনতা মেনে নেবে। প্রবল উদ্যমে দুর্যোধন মরিয়া হয়ে লড়ছিল।

ভীম এ যুদ্ধে পরাজিত কিংবা নিহত হলে পাণ্ডবদের মধ্যে আর কাউকে ভয় করার নেই তার। দুর্যোধন তাই মারমুখী হলো। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল তার। গা বেয়ে গল গল করে ঘাম গড়াতে লাগল। লড়াই করতে করতে ভীম শ্রান্ত হয়ে পড়ল। একসময় দুর্যোধনের গদা ভীমের বুকে লাগল। সে আঘাতে ভীম অচেতন হয়ে পড়ল। কৃষ্ণসহ পাণ্ডবেরা এবং পাঞ্চালেরা বেশ ভীত এবং বিব্রত হলো। এক, দুই, তিন গোনার মধ্যে ভীম উঠতে পারল না। ধরাশায়ী হয়ে রইল। বিজয়োল্লাসে দুর্যোধন চিৎকার করে বলল ঃ যুধিষ্ঠির! ভীম মাটিতে শয্যা নিয়েছে। উত্থানশক্তি রহিত। মাটিতে এভাবেই পড়ে থাকবে। তোমরা এখন পরাজিত। তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর। আমার রাজ্য আমাকে ফিরিয়ে দাও।

ভীম হঠাৎই অচৈতন্য থেকে চৈতন্যে ফিরল। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কৃষ্ণ চিৎকার করে বলল ঃ ভীমকে হারানো সহজ নয়। সে মূর্ছা যায়নি। ছল করে পড়ে ছিল। তোমার আক্রমণের প্রতীক্ষায়। কিন্তু তুমি এত ভীরু যে, তার কাছে যেতে ভয় পেলে। তোমার রাজ্য তৃষ্ণায় ধিক্। তুমি যুদ্ধ কর। ভীম তোমাদের সব ভাইকে যমালয় পাঠিয়েছে। কৌরবসভায় দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নেবে বলে সর্বজন সমক্ষে তোমার উরু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেছিল। ভুলে যেও না, প্রতিজ্ঞায় ভীম ভীষণ। যে করে

হোক, ভীম শপথ রক্ষা করবেই। রাজ্যলাভের স্বপ্ন ছেড়ে কঠিন বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

ভীমের মূর্ছাভঙ্গের সংবাদে দুর্যোধন বেশ একটু হকচাকিয়ে গেল। প্রত্যাশায় আঘাত লাগার চমকানো বিস্ময়ে সে ফিরে দাঁড়াল। উল্লাস থেমে গেল। গলা থেকে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল। খুব কষ্টে সামলে নিল। ভীমের চৈতন্যপ্রাপ্তিতে সে বড় বেশি চমকে উঠেছিল। আশাভঙ্গের বেদনায় ছাই হয়ে গেল মুখ।

ভীম স্খলিত পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে ঈষৎ ভয় এবং উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার ভাব থম থম করছিল। অপমান করার জন্যেই দুর্যোধন বলল ঃ বড্ড লেগেছে তাই না? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না, লড়াই করবে কি করে? তার চেয়ে বরং হার স্বীকার করে নাও।

ভীম বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল ঃ তোমার সহানুভূতি কে চেয়েছে? বিষ খাইয়ে তো মারতে চেয়েছিলে? কিন্তু তোমার নিয়তিই আমাকে বাঁচিয়ে রাখল। আমার হাতেই তোমার মরণ। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

দুর্যোধন হাসে। বলল ঃ মরণ যেমনভাবে হবার হবে। ভেবে-চিন্তে আগে থাকতে সাবধান হয়ে কেউ কিছু করতে পারে? মরণের কথা ভাবলে যন্ত্রণা বেশি হয়। মরতেই যদি হয় তবে তার কথা ভাবব কেন? সারাজীবন তো শুধু গালিগালাজ করলে, এবার না হয় গদার ভাষায় কথা বললে।

কিছু বুঝে উঠার আগেই ভীমের অতর্কিত আক্রমণে দুর্যোধন ধরাশায়ী হলো। মাটিতে পড়ে দুর্যোধন হাসতে হাসতে ভীমের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগল। পাণ্ডব এবং পাঞ্চালেরা আনন্দে উত্তেজনায় হৈ-হৈ করে উঠল। বিভিন্ন ভাষায় ভীমকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করতে লাগল। কিন্তু দুর্যোধনকে উৎসাহ দেবার কেউ নেই। সে একেবারেই একা। তার বাঁচা কেউ চায় না। তাকে হত্যা করার জন্যে সবাই ভীমকে লেলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ-ই মরিয়া হয়ে গদার ধাক্কা দিয়ে ভীমকে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। ভীমের মাথা লক্ষ্য করে গদা নিক্ষেপ করল। খুব অল্পের জোরে ভীম মাথা বাঁচাল।

কিন্তু ঘুরন্ত গদার আঁচড় লেগে কপাল ফেটে রক্ত বেরোল। ভী তাতে দমল না। ঘামের মতো রক্ত মুছে নিয়ে নতুন করে দুর্যোধনকে ভিন্ন কৌশলে আক্রমণ করল।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় দুর্যোধন অবসাদ বোধ করেছিল। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিল ; তাকে শ্রান্ত হতে দেখে পাণ্ডবেরা উল্লসিত হলো। কিন্তু দুর্যোধন তাদের সেই আনন্দ, উত্তেজনাকে দীর্ঘস্থায়ী করল না। গদা নিয়ে নিজের ক্রীড়া দেখাল। তারপর আবার ভীমকে আক্রমণ করল। সেই সাংঘাতিক আক্রমণে ভীম মাটিতে পড়ে গেল। সুযোগ বুঝে দুর্যোধন ভীমের বর্ম ভেঙে চূর্ণ চূর্ণ করল। অচৈতন্য হয়ে ভীম মাটিতে পড়ে গেল। দু'জনের শরীর রক্তাপ্লুত। ভীমের অবস্থা দেখে কৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণল।

পঞ্চতীর্থ পর্যটন সমাপ্ত করে বলরাম দ্বৈপায়নের ধার ধরে যমুনার দিকে চলেছিল। দুর্যোধন ও ভীমের গদাযুদ্ধ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাণ্ডবদের ভেতরে এসে দাঁড়াল। দুর্যোধনের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে হর্ষ প্রকাশ করে বলল ঃ সাবাস দুর্যোধন! আমার শিক্ষা তুমি সার্থক করেছ। আচার্য দ্রোণের গর্ব যেমন অর্জুন, আমার গর্ব তুমি। ভীমের সাধ্য কি তোমাকে হারায়? ভীম যত বড় বীর হোক, শক্তিমান হোক, গদা যুদ্ধে তোমার নৈপুণ্য তার নেই।

বলরামের কথা শুনে কৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ হলো। চোখে তার বিরক্তির আভাস।

ভীম উঠার চেষ্টা করল, কিন্তু যন্ত্রণায় সারা শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছিল। উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির হতাশ গলায় বলল ঃ কৃষ্ণ কী হবে?

অর্জুন স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে গেল। ভীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। বলল ঃ ভীম পাঞ্চালীর অপমান তুমি ভুলে গেলে? একদিন বড় মুখ করে কৌরব সভায় বলেছিলে, দুর্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করে তার কুৎসিত ইঙ্গিতের প্রতিশোধ নেবে। মরার আগে দুর্যোধনের ঊরুদ্বয় ভেঙে আত্মপ্রতিজ্ঞা পালন কর।

সহদেব চিৎকার করে বলল ঃ মধ্যম পাণ্ডব কৌরবসভায় যখন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে রাজসভায় টেনে এনেছিল তখন ঐ পাষণ্ড, বর্বর দুর্যোধন আমাদের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টার হাসি হেসে

বলেছিল ঃ ওগো সুন্দরী তোমার যোগ্য স্থান দুর্যোধনের কোল। পাঞ্চালীকে অংকশায়িনী করার সেই প্রস্তাব তুমি ভুলে গেলে? ভুলে গেলে তোমার কঠিন প্রতিজ্ঞা। এই ভয়ংকর প্রতিশোধের আগুন বুকে জ্বালিয়ে রাখার জন্যে তুমি রাতে ঘুমোতে না। ভালো করে কারো সঙ্গে কথা বলতে না। সেই তোমার একি অবস্থা? পাঞ্চালীর অপমানের প্রতিশোধ নেয়া না হলে তার অপমানের সান্ত্বনা কী থাকল? তুমিই তার ভরসা। তুমি ছাড়া আর কোন পাণ্ডব তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেনি। সে তোমার মুখ চেয়ে আছে। তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে থাকলে পাঞ্চালীর কী হবে? আমরা তাকে কী বলব?

হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে ভীম যেন মুখ তুলল। পাঞ্চালীর কথা সত্যিই ভুলে গিয়েছিল সে। সহদেবের কথাগুলো তার সারা শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল।

কৃষ্ণ চিন্তিত। দিশেহারা ভাবনা আর আতঙ্ক যুধিষ্ঠিরের চোখেমুখে। হতাশ গলায় বলল ঃ সখা, এখন উপায়? ভীম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওর সর্বাঙ্গ ধুলোয় ধূসর। কী হবে ভীমের?

কৃষ্ণের চোখে মুখে চাউনিতে একটা কঠিন সংকল্প আঁটা। মধ্যম পাণ্ডবকে রক্ষার সংকল্প। যুধিষ্ঠিরকে একান্তে ডেকে বলল ঃ অন্যায় যুদ্ধ ছাড়া দুর্যোধনকে বধ করা সম্ভব নয়। আমাদের সর্বনাশ ঠেকাতে এখনি তাকে অন্যায়ভাবে উরুতে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করার নির্দেশ পাঠাও। দ্বিধা করার সময় নেই।

কৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠির একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। ভীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল ঃ মধ্যম পাণ্ডব গদা যুদ্ধে তোমার মতো কৌশলী কে আছে? দুর্যোধন তোমার যোগ্য নয়। তাকে সমুচিত শিক্ষা দাও। হাসি হাসি মুখ করে কৃষ্ণ নিজের জঙ্ঘায় আঘাত করে ভীমকে দুর্যোধনের জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থলে আঘাত করার সঙ্কেত পাঠাল।

ভীম সর্বশক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। রক্তাক্ত কলেবর হলেও মনের জোর ফিরে পেল। দুর্যোধনও অবসন্ন বোধ করছিল। তারও শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। দেহ টলছিল। ক্লান্তিতে দু'চোখ বুজে

আসছিল। একটা ঘোরের মধ্যে গদা হাতে ভীমের দিকে তেড়ে গেল। ভীম পিছিয়ে যেতেই দুর্যোধন বিশাল লাফ দিয়ে, শূন্যে উঠে, ভীমের মাথা লক্ষ্য করে গদা চালল। ভীম দুর্যোধনের এই শূন্যে লাফ দেবার সুযোগ নিল। মুহূর্তে সর্বশক্তি নিয়ে দুর্যোধনের জঙ্ঘার সন্ধিস্থল লক্ষ্য করে সজোরে গদা ছুঁড়ে মারল। আর তাতেই দুর্যোধনের ঊরুদ্বয় ভেঙে চুর চুর হয়ে গেল। বিশাল দেহ নিয়ে মাটিতে ধপাস করে আছড়ে পড়ল। আর উঠতে পারল না। দুর্যোধন পা নাড়তে পারছে না। কোমর তুলতে পারছে না। স্থানুর মতো মাটিতে পড়ে ভীষণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

তখন পাণ্ডবদের কী ভীষণ উল্লাস। ভেরী, শঙ্খ বাজিয়ে তারা জয়োল্লাস করতে লাগল।

প্রিয় শিষ্য দুর্যোধনকে ভীম অন্যায়যুদ্ধে ধরাশায়ী করায় বলরাম ক্ষেপে গেল। নিজের হল নিয়ে তেড়ে গেল ভীমের দিকে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল: ভীম নাভির নিচে গদাঘাত করা অন্যায়। এই নীতিহীন যুদ্ধ করে তুমি ধর্মের পাতক হয়েছে। গদা যুদ্ধে এ শঠতা আমি সইতে পারব না। তুমি গদা যুদ্ধের নীতি ভেঙে অন্যায় করেছ। তোমাকে আমি সমুচিত শাস্তি না নিয়ে নিবৃত্ত হব না।

কৃষ্ণ বিপদ বুঝে বলরামকে শান্ত করতে তার পাশে দাঁড়াল। নিবৃত্ত করার জন্যে বলল: তুমি তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিজেকে জড়াবে না বলে সরে দাঁড়িয়েছ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শেষ মুহূর্তে ক্রোধের বশে ভীমকে আক্রমণ করে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে? তাছাড়া, যুদ্ধের নীতিধর্ম হলো যে কোন উপায়ে জেতা। জেতাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

বলরাম নিজের ভুল বুঝতে পেরে সংযত হলো। কিন্তু কৃষ্ণের বাক্যে এবং যুক্তিতে সন্তুষ্ট হলো না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল: ভীমের অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। কৃষ্ণ তুমি এই অধর্ম যুদ্ধের স্রষ্টা। অধর্ম যুদ্ধ ছাড়া তোমরা কৌরবদের হারাতে পারতে না। তোমাদের অন্যায়, অধর্ম, ভীমের জঘন্য অপরাধ আমি মন থেকে দূর করতে পারছি না?

কৃষ্ণ সবিনয়ে বলল ঃ অগ্রজ, তুমি শান্তপ্রকৃতির ধর্মবৎসল মানুষ। কূটযুদ্ধ না করলে যে পাণ্ডবেরা জিততে পারবে না আমার চেয়ে সে কথা বেশি কে জানে? কিন্তু যুদ্ধে যে জিতল তার জয়ের কথাই লোকে মনে রাখে। কিভাবে জিতল সেটা তুচ্ছ ব্যাপার। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ছাড়া এই যুদ্ধে আমরা কেউ কিছু করিনি। আমি, তুমি, ভীষ্ম, কর্ণ, ভীম সবাই প্রতিজ্ঞা রক্ষা ছাড়া কিছু করেনি। সুতরাং এ আমাদের নিয়তি। কারো করার কিছু নেই। তুমি নিবৃত্ত হও।

বলরামের চোখে এবং চাহনিতে বিরক্তি এবং বিতৃষ্ণার ভাব ফুটল। বলল ঃ তোমাব সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়, এমন কাজ কখনো করিনি। তোমার অর্থহীন যুক্তি আমি মেনে নিতে পারছি না। ইতিহাসে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কূট-যোদ্ধা বলে সম্মানিত হবে তুমি। হয়তো আগামী প্রজন্মে ধর্মকে হত্যা করার রণনীতি তোমার সমাদৃত হবে। তবু, তুমি চিরনিন্দিত হবে। আর ন্যায় যুদ্ধ করার জন্যে দুর্যোধন চিরকাল পুজো পাবে। ইতিহাস তোমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ শুনে আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। রাজ্যের উপর নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেছে। আমার বিশ্বাসই মরে গেছে। কী নিয়ে আর থাকব? তোমাদের কুৎসিত রাজনীতিতে আমার কোন স্থান নেই, এখানে আমি একেবারেই বেমানান।

বলরাম রাগে দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে দ্বৈপায়ন ত্যাগ করে চলে গেল। একবারও পিছন ফিরে দেখল না কৃষ্ণ স্থাণুর মতো তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে।

ভীমের দুচোখ প্রতিহিংসায় ধক ধক করে জ্বলছে। বুনো মহিষের মতো রাগে ফুঁসছে। হঠাৎই দৌড়ে এসে দুর্যোধনের হাত থেকে গদা ছিনিয়ে নিল। মাথায় পা দিয়ে মাটির সঙ্গে নির্মমভাবে পিষ্ট করতে লাগল।

ভীম ভুলে গেল সে বীর। ভুলে গেল তার শিক্ষা-দীক্ষা। যে ভাষায় কোনদিন কথা বলেনি সেই ভাষায় ভীম বলল ঃ দুর্যোধন, বংশের কুলাঙ্গার তোর আস্ফালন চিরতরে স্তব্ধ করে দিলাম। মনে পড়ে শয়তান, কৌরব সভায় রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে সভা মধ্যে

সর্বজন সমক্ষে বিবস্ত্রা করেছিলি। নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে সে যখন অসহায়ভাবে পরম করুণাময় ভগবানকে ডাকছিল তখন তুই বিদ্রূপ করে আমাদের গরু এবং ক্লীব বলেছিলি। বলেছিলিস, ঈশ্বর পাষাণ বিগ্রহ তাকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। তাই দ্রৌপদীকে তোর ভজনা করতে বলেছিলি। শয়তান, সেই অপমানের, বিদ্রূপের জবাব দিতে তোর মুখখানা মাটিতে থেঁতলে দিলাম।

ভীম বাঁ পা দিয়ে দুর্যোধনের মাথাটা মাটিতে পিঁষতে লাগল। হঠাৎ-ই ভীম আদিম হিংস্রতায় আরো বন্য, বর্বর, নৃশংস হয়ে উঠল। প্রতিহিংসার ঘরে তার দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। মরিয়া হয়ে দুর্যোধনের মুখখানা মাটিতে ঘষে ঘষে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। প্রতিরোধের শক্তি ছিল না তার। সর্বাঙ্গ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

সমস্ত ঘটনাটা এত দ্রুত এবং চকিতে ঘটল যে সবাই হতভম্ব হয়ে নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ সেই দৃশ্য দেখল নির্বাক বিস্ময়ে। কতক্ষণ তারা ঐভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক নেই। হাঁফাতে হাঁফাতে ভীম যখন মাটিতে ধপ্ করে বসে পড়ল তখনই তাদের আত্মবিস্মৃতি ভঙ্গ হলো।

দুর্যোধনের রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত মুখের দিকে চেয়ে যুধিষ্ঠিরের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। চকিতে বুকের ভেতর ধিক্কার জমল। বলল ঃ ছিঃ, ছিঃ মধ্যম পাণ্ডব এ তুমি করলে কি? ক্রোধের বশে নিজেকে কত ছোট করলে তা বোঝার মতো মন তোমার নেই। থাকলে, এমন নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ করতে না। কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ কৃষ্ণ তুমি কিছু বলছ না কেন? এতবড় একটা জঘন্য কাজ চোখে দেখেও ভীমকে তিরস্কার করবে না।

কৃষ্ণের দু'চোখে নীরব হাসি। জীবন রহস্য বোঝার কৌতুক। বলল ঃ দুর্যোধনের বিরুদ্ধে জমানো আক্রোশের বিস্ফোরণ ঘটে গেল ভীমের মধ্যে। ও শুধু ঘেন্নাটাই উগরে দিল। ওর কাজের মধ্যে একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। এক অন্ধ পাশবিক ক্রোধের জন্যে তাই ও কিছুক্ষণ মানুষ ছিল না। জঙ্গলের রহস্যের মতো মানুষের মনের জঙ্গলে কতরকমের যে জানোয়ার আছে মানুষ নিজেও জানে না। কেবল তাদের মুখোমুখি হলেই টের পাওয়া

যায়। ব্যাধের বানে নিহত ক্রৌঞ্চের শোকে ক্রৌঞ্চীর বোবা কান্না দস্যু রত্নাকরের পাষাণ বুকে করুণার সাগর তৈরী করল। তাই, একজন মানুষ যে অপরাধই করুক সে রহস্য পুরোপুরি ভেদ না করলে তার মনের ঠিকানা পাওয়া সম্ভব নয়। একজন নিষ্ঠুর দস্যুও তার খুনের অপরাধের জন্যে পাপের জন্যে নিশব্দে কেঁই কেঁই করে কাঁদে। তার সেই কান্না বাইরে দেখা যায় না। একটা মানুষ সত্যি সত্যি যে ভিতরে ভিতরে কাঁদছে তা যদি তার বাইরে হা-হুতাশের আগে জানতে না পারল তাহলে সে দোষটা যারা অপরাধী করছে তাদের। মানুষ হলেই সে তার দুষ্কর্মের জন্যে, অপরাধের জন্যে কাঁদে। বাইরের কান্না তো চোখের কান্না। ভীমের কান্না, সে কান্না নয়। তার বুকের মধ্যে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে সখা হয়ে যদি সেটা না বুঝতে পারি তা, হলে তার কাছে নিজেকে ছোট করা হবে। ভীমের ভেতর সব তাপ একটু কমে এলে জঘন্য কাজের জন্যে নিজেই অনুতপ্ত হবে। ঐ দ্যাখ ধর্মরাজ, বোবা কান্না বুকে করে ভীম মাটিতে উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। ভীমের মতো শক্ত মানুষেরা একা একা কাঁদে। ওরকম দমবদ্ধ কান্না নিজের পাপের জন্যে ক'জন কাঁদে। বোবা কান্নার ভার থেকে যতক্ষণ মুক্ত করতে পারবে না নিজেকে ততক্ষণ মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে।

যুধিষ্ঠিরের দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো। ভীমের কষ্টে তার বুক উথাল পাথাল করে উঠল। বুকের ভেতরটা এক ধরনের করুণায় ভরে যেতে লাগল। ভীমের মাথার উপর হাত রাখল যুধিষ্ঠির। স্নেহের হাত, সান্ত্বনার স্পর্শ। বিগলিত গলায় বলল, মধ্যম সব কথা সবার বোঝার নয়, আর বোঝানো যায় না বলেই আমরা এত কষ্ট পাই। একে অন্যকে ভুল বুঝে আঘাত করি। তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, আমার মনের কথা।

ভীম মাটিতে মুখ লুকিয়ে বলল : অগ্রজ, অনেক মূল্যে আমরা এখন শত্রু শূন্য। তুমি নিষ্কটক রাজ্য ভোগ করবে। কিন্তু আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব ?

বিগলিত প্রসন্ন গলায় যুধিষ্ঠির বলল : তুমি এমন কিছু অন্যায় করনি যা তার আগে অন্য মানুষের জীবনে ঘটেনি। তবে

দুঃখটা কিসের? অনুশোচনাই বা করবে কেন? কার জন্যে? মনের ভেতর জমানো রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণাকে হত্যা করে তুমি শুচি হয়ে উঠেছ। পাপবোধে কষ্ট পাবে কেন? তবে, মানুষ হিসেবে একটা মানুষের জন্যে দুঃখ, বেদনা, কষ্ট যদি না থাকল তবে সে মানুষ কিসের? তাই একজন মানুষকে সমস্তরকম অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পেছনে ঈশ্বরের কোন গভীর উদ্দেশ্য হয়তো আছে। মানুষের সেটা বোঝার ক্ষমতা নেই বলেই হয়তো মনে হয় ঈশ্বর পরম করুণাময়, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যে। হয়তো তোমার এই অনুতাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা না থাকলে মানুষের মনে তুমি দানব হয়ে থাকতে। তোমার মানুষ হওয়ার জন্যেই এই শাস্তি এবং যন্ত্রণাটুকু পাওয়ার দরকার ছিল।

কৃষ্ণ দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে আছে। যুদ্ধে কত মানুষকে মরতে দেখেছে, নিজের হাতে মেরেছেও অনেক। কিন্তু তারা কেউ দুর্যোধনের মৃত্যুর মতো নজর কেড়ে নেয়নি! যুদ্ধক্ষেত্রে কত মানুষ মরে পড়ে আছে, দুর্যোধনের মতোই দু'খানা পা ফাঁক করে ঈষৎ হাঁটু মোড়া অবস্থায়, হাত টান টান করে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। মুমূর্ষু যোদ্ধাকে আহত অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখেছি। কিন্তু তাদের কারো চেহারা মনে নেই। কাউকে মনেও পড়ে না ভালো করে। কোন কোন দৃশ্য ঘটনা মনেতে এমন করে গেঁথে যায় যে তাকে আর ভোলা যায় না। দুর্যোধনের মৃত্যু দৃশ্যটা তেমনি করে মনে দাগ কাটল। মনের চাওয়া না হলে কোন কিছু মনেতে ছাপ রাখে না।

আঘাতের ব্যথায় যন্ত্রণায় দুর্যোধন কাতরাচ্ছিল। পা দু'খানা তার নাড়ানোর শক্তি ছিল না। যন্ত্রণায় পেশীর মধ্যে একটা আলোড়ন হচ্ছিল। চিঁড়িক দিয়ে কোমরের নিম্নাংশ মাঝে মাঝে নড়ে উঠছিল। আর এক অসহনীয় যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত রক্তমাখা মুখখানা বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার জ্ঞান ছিল পুরো।

দুর্যোধন চোখে না দেখলেও অনুভূতি দিয়ে অনুভব করল কৃষ্ণের উপস্থিতি। কৃষ্ণ তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলল: দুর্যোধন আমার প্রতি তোমার একটু আনুগত্য যদি থাকত তা হলে এত অপমান নিয়ে মরতে হতো না। আজ আমার নিজেরই বুক বড়

খালি লাগছে। বড় ইচ্ছে হচ্ছে তোমার শরীরটাকে একটু আলিঙ্গন করি, বুকে চেপে ধরি। এখন তো আমি ভারমুক্ত। আমার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আমি একেবারে একা হয়ে গেছি।

দুর্যোধনের যন্ত্রণাকাতর মুখে একটা খুশির আভা ফুটে উঠল। ভারাক্রান্ত গলায় বলল: অনুশোচনা হচ্ছে।

আবেগ গাঢ় গলায় বলল: না। বিস্ময়ে আমি অবাক হয়ে যেতাম, সারা ভারতের রাজন্যবর্গ যার ছত্রচ্ছায়ায় দাঁড়িয়েছে তার প্রতাপ, মান, মর্যাদা, যশ, খ্যাতি, সমাদর, ব্যক্তিত্ব, তেজ, অসীম দুঃসাহস, অনন্ত আত্মবিশ্বাস এবং বড় হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে ঈর্ষা না করে পারেনি। আসমুদ্র ভারতের উপর আধিপত্য করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি তোমার একমাত্র লক্ষ্য না হতো তা-হলে তোমার আমার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন বিরোধ কিংবা সংঘর্ষ থাকত না। শুধু এজন্যে তোমার সঙ্গে আমি শত্রুতা করেছি। তোমার আমার রেষারেষি, বিরোধ, শত্রুতা খালি চোখে দেখা যেত না। বুদ্ধির কাজিয়া হতো আমাদের মধ্যে। জ্যেষ্ঠ বলরামের প্রিয় হওয়ার সুযোগ নিয়ে তুমি তাকে আমাদের বিবাদের মধ্যে টেনে এনেছ। আমাদের ভায়ে ভায়ে সম্পর্কে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করেছ। তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবার জন্যেই ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রিয়তম শাম্বের সঙ্গে তোমার কন্যা লক্ষ্মণার প্রণয় বন্ধন মেনে নিয়েছি। বলরাম মধ্যস্থ না করলে এ বিয়ে হতো না। জেদে জিতে তুমি আড়ালে হেসেছ। আজ আমি জিতে তোমাকে কৌতুক করছি। বুদ্ধির কাজিয়ায় হেরে গেছ তুমি। তোমার উপর আমার যে রাগই থাক এখন আর নেই। তুমি সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছ। তোমাকে কাঠ কাঠ শক্ত কথা বলে লাভ নেই।

কৃষ্ণের কথা শুনে দুর্যোধনের অভিব্যক্তিহীন দুই চোখের কোটরে ব্যথা জমে উঠল। সারা শরীরটা ব্যথায় মোচড় দিল। পিঠটা উঁচু করার চেষ্টা করল, কিন্তু মেরুদণ্ড ভঙ্গ হওয়ার জন্যে পারল না। হাতের উপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে কৃষ্ণের দিকে তাকাল। প্রাণ বের করে দেওয়া ব্যথা বেদনা তুচ্ছ করে কৃষ্ণের দিকে ফিরে কাতরাতে কাতরাতে বলল: কৃষ্ণ তুমি বড় নিষ্ঠুর। তোমার

হৃদয়, মন বলে কিছু নেই। শত্রুকে তুমি মানুষ বলে মনে কর না। মানুষের কোন মর্যাদা দাও না, শ্রদ্ধাও করনা তাকে। অন্তিম যাত্রাকালে দুটো ভালো কথা বলা দূরে থাক, কি করে দুঃখ দেয়া যায় যন্ত্রণা বাড়ানো যায়, মৃত্যুর কষ্টকে আরো বেদনাদায়ক করা যায় তার জন্যেই সহানুভূতির বদলে অভিযোগ, সান্ত্বনার বদলে তিরস্কার করছ। বিদ্রূপ করছ। তোমার কূট বুদ্ধিতেই আমার এ অবস্থা। যদি তুমি ধর্মযুদ্ধ করতে তা হলে তোমার সাধ্য ছিল না আমাকে পরাজিত করা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ হয়নি।

কৃষ্ণ হাসল। বলল ঃ আর কতক্ষণই বা বাঁচবে? সত্য কথাটা অকপটে স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার দোষে, তোমার লোভে আর অতিরিক্ত রাজ্যস্পৃহাতেই তুমি সব খোয়ালে— তোমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব নিহত হলো, অবশেষে তুমিও তার ফলভোগ করছ। তবু দাম্ভিকের আত্মতৃপ্তি থেকে মুক্ত হলো না তোমার মন। তাই অভিযোগের অন্ত নেই।

দুর্যোধন দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ক্লান্তস্বরে মৃদু কণ্ঠে থেমে থেমে উচ্চারণ করল ঃ শত্রুর মাথায় পা দিয়ে নিজের হাতে শাসন করেছি এই সসাগরা পৃথিবী। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার দম্ভ হওয়া স্বাভাবিক। দম্ভে, ক্রোধে শত্রুকে অমানুষ মনে করিনি। ক্ষতি করার ক্ষমতা যার আছে সেই শত্রু! আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি। কিন্তু তুমি আমার ক্ষতি করতে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছ। কেন দিলে তুমি জান। বোধহয়, আমার রাজনৈতিক উত্থান তুমি চাওনি। তাই পাণ্ডবদের সঙ্গে আঁতাত করে আমার রাজনৈতিক অন্দরমহলে ঢুকে পড়লে। তোমার এই অবাঞ্ছিত প্রবেশের বিরোধিতা করা কিন্তু শত্রুতা করা নয়। তবু আমাকে তোমার শত্রু ভাবলে। সেই ভুলের উপর যবনিকা টেনে দেবার জন্যেই তোমার প্রিয় পুত্র শাম্বর সঙ্গে আমার প্রিয়তম কন্যা লক্ষ্মণার বিয়ে দিয়ে তোমার রাগের এবং ক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শত্রুতাকে জীইয়ে রাখতে তুমি পাণ্ডবদের পক্ষ নিলে। তোমার স্বার্থেই রাজ্যচ্যুত পাণ্ডবদের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার ছিল। পাণ্ডবেরা নির্বোধ বলেই তোমার অনুগ্রহ কৃপাকে তারা বন্ধুত্ব মনে করেছে। তাদের

ভুলে, লোভে এবং রাজ্যস্পৃহাতেই এই পৃথিবীটা মহাশ্মশান হয়ে গেল। পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলে তুমি এই শূন্য পৃথিবী ভোগ কর। এখানে জীবন নেই, প্রেম নেই আছে প্রাণের হাহুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, অসহায় কান্না আর অনন্ত অভিশাপ। সিংহাসন তোমাদের কণ্টকাসন হবে। যে প্রত্যাশা নিয়ে তুমি জয়ের গৌরব করলে অচিরেই তা হতাশায় পরিণত হবে। নিজেকে প্রশ্ন করবে—কাকে জয় করলাম? ধর্ম যুদ্ধে কাকে হত্যা করলে? মানুষের ভাল চাইতে গিয়ে কোন অমঙ্গলকে বরণ করলে? অসুন্দর, অসত্যকে জয় করলে শক্তি দিয়ে, অসুরত্ব দিয়ে।

কৃষ্ণ মাথা হেঁট করে রইল। বলিরেখাঙ্কিত পাণ্ডুর তার কপোল। ভারতীয় ভাস্কর্যের মতোই ভাষাহারা মণিহারা চোখ।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

পান্ডবেরা তুমুল হর্ষধ্বনি করতে করতে শিবিরের দিকে ফিরল। আনন্দে সৈন্যেরা উত্তরীয় ওড়াতে লাগল। কেউ বা ধনুকে তীর জুড়ে আকাশের দিকে ছুঁড়তে লাগল। কেউ অঙ্গভঙ্গী করে, রঙ্গ করে নাচছিল। পাণ্ডবেরা বিদায় নিলে জায়গাটা ভীষণ নির্জন হয়ে গেল।

দ্বৈপায়নে হ্রদের বুক থেকে উঠে আসা মন্থর বাতাস মুমূর্ষু দুর্যোধনের ক্ষীণ শ্বাসের অস্পষ্ট শব্দ বয়ে নিয়ে এল। এক অদ্ভুত হাহাকারের শব্দ নিয়ে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরের উপর দিয়ে শোকে উন্মাদিনী জননীর মতো সরু স্বরে কেঁদে উঠে কুয়াশা মাখা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দৌড়ে গেল যেন।

পাণ্ডবেরা চলে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, আচার্য কৃপ এল। মাটিতে দুর্যোধন শুয়ে আছে। জড়বৎ দেহ অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। মুখ থেকে কষ্টকর যন্ত্রণার গোঙানির ক্ষীণ শব্দ বার হচ্ছিল। ক্লান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্বাভাবিক শব্দ, আর্তস্বর, নির্জন নিঃশব্দ অরণ্যকেও ভারাক্রান্ত করে তুলল। সকলের মনেই একটা চাপা উত্তেজনা। কিন্তু প্রকাশ নেই কারো। কিন্তু তাদের গলার মোটা শিরাটা দপদপ করে ফুলে

উঠল। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে তাদের দু'চোখে আহত বাঘের মতো।

অশ্বত্থামার মুখটা রাগে আর হিংসায় কুৎসিত দেখাল। তিনজনের মধ্যে প্রথম কথা বলল সে। কী বীভৎসভাবে দুর্যোধনকে হত্যা করছে ভীম। চোখে দেখা যায় না। ভীমের মধ্যে কিছু বিনা প্রয়োজনের নিষ্ঠুরতা আছে। একটা মুমূর্ষু মানুষের উপর এতখানি পাশব ক্রোধ না দেখালে ভীমের খুব একটা ক্ষতি হতো কি? কোন মানুষ বোধ হয় এত বর্বর, হিংস্র, নিষ্ঠুর হয় না।

কৃপাচার্য দুর্যোধনের অবস্থা দেখে কান্নারোধ করতে পারল না। দু'চোখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ল। বুক হাহাকার করা কান্নার গলায় বলল : এ আমি কী দেখছি? এই দৃশ্য দেখার জন্যে বিধাতা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে? দুর্যোধন, পুত্র আমার, একদিন ভ্রমের বশে তোমার উপর অনেক অবিচার করেছি। গালমন্দ, তিরস্কার করেছি। কত কটু কথা বলে অপমান করেছি। তোমার ভালো চাইতাম বলেই বকা-ঝকা করতাম। কিন্তু তার পরিণাম এমন মর্মান্তিক হবে ভাবিনি। বুড়ো বয়সে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে হবে কল্পনাও করিনি। অনুশোচনায় বুক আমার ফেটে যাচ্ছে।

কৃপাচার্য সম্মোহিতের মতো উঠে গিয়ে দুর্যোধনের মাথায় হাত রাখল। তার ডান হাতখানা আস্তে আস্তে তুলে ধরে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। এই প্রথম এ জীবনে তাকে এমন করে আদর করল। কৃপের চোখের কোন দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। দুর্যোধনের হাত দিয়ে চোখ মুছল। মুখ নামিয়ে আনল তার রক্তাক্ত বীভৎস মুখের কাছে। তারপর নিজের মুখ রাখল তার মুখের উপর। তাকে আদর জানাতে শুধু নয়, তার শরীরের সব ব্যথা, যন্ত্রণা, কষ্টকে নিঃশেষে শুষে নেবার জন্যে।

দুর্যোধনের ভেতর জ্ঞান ছিল। আচার্যের স্পর্শে তার বুকের ভেতর জমাটবাঁধা অভিমানটা হঠাৎ-ই গলতে শুরু করল। চোখের ধারা হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। স্থির হয়ে রইল সমর্পনের নীরব স্বীকৃতিতে।

অনুশোচনা হলো কৃপের। তার ভেতর লুকিয়ে থাকা পাঞ্চাল বিদ্বেষী মনটা হঠাৎ বিদ্রোহী হলো। পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর

তৃপ্তির জন্যে, সুখের জন্যে, আনন্দের জন্যে ভীমের ভেতর আদিম হিংস্র সত্তাটি এমন বর্বর নৃশংস হয়ে উঠেছিল। দুর্যোধনের মর্মান্তিক নিষ্ঠুর মৃত্যুর মূলে আছে পাঞ্চালী।

কৃপ নিজে পাঞ্চাল দেশের সন্তান। কিন্তু শৈশবেই পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন হওয়ার জন্যেই পাঞ্চাল থেকে পরিত্যক্ত হয়েছিল। শৈশবের কোন ঘটনাই মনে নেই। কিন্তু পাঞ্চালে তার এবং ভগিনী কৃপীর কোন স্থান হয়নি। দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি সুতীব্র অভিমান থেকে তার মনে পাঞ্চাল বিদ্বেষ জন্মেছিল। পাঞ্চালের উপর তার দীর্ঘকালের অবদমিত ক্রোধ, বিতৃষ্ণার ঘরে দাউ দাউ করে আক্রোশের আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনে পাঞ্চালীর সুখ, আনন্দকে পুড়িয়ে ছাই যদি করতে না পারল তা-হলে কিসের পাঞ্চাল বিদ্বেষ তার ? শরীরের মধ্যে প্রতিহিংসার দপদপানি সুরু হলো। নিজেকে চরিতার্থ করার মধ্যে হয়তো তীব্রতর কোন সুখ চাপা থাকে। হঠাৎ সেই তীব্র আনন্দের যন্ত্রণায় দৃঢ় হয়ে উঠে তার ভেতরটা।

দুর্যোধনের দুগালে দুটি হাতের পাতা ছুঁয়ে বলল : দুর্যোধন, তোমার এই মৃত্যু দৃশ্যটা যতদিন মনে থাকবে ততদিন পাঞ্চাল আর পাণ্ডবকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। তোমার এই মর্মান্তিক মৃত্যুর পেছনে যারা আছে তাদের বংশে দীপ জ্বালানোর মতো একটি মানুষও থাকবে না।

দুর্যোধনের দু'চোখের বোজা পাতা ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। আস্তে অস্ফুট স্বরে থেমে থেমে বলল : আমার আর কষ্ট নেই। এখন আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি। তার কথাগুলো জড়ানো, অস্পষ্ট। আচার্য, পৃথিবীতে যারা বলে যথা ধর্ম তথা জয়—তারা সত্যি কথা বলে না। অধর্মই ধর্মকে হত্যা করে। আমার মৃত্যু দিয়ে তার সব ঋণ শোধ হবে হয়তো। বন্ধুরা, এ যুদ্ধে আমি সকলকে টেনে এনেছি। তারা যেভাবে নিহত হয়েছে, আমিও সেইভাবে নিহত হলাম। আমার মনে আর কোন দুঃখ নেই। তোমরাও দুঃখ কর না। ধরিত্রী মায়ের অনাবৃত বুকের উপর শুয়ে আমি অনুভব করছি, সংসারে কোন কিছুই বিনাশে শূন্য হয় না। শূন্য জায়গা পূরণ করার জন্যে আবার নতুন মানুষ

আসে। এই যুদ্ধের ভার আমি তোমাদের হাতে দিয়ে গেলাম।

দুর্যোধন আর কথা বলতে পারছিল না। সে কষ্টে হাঁফাচ্ছিল। ব্যথা ও যন্ত্রনায় চুপ করে পড়ে রইল। অশ্বত্থামা তার দুরন্ত দুরবস্থা দেখে কিছুতেই শান্ত হতে পারছিল না। বলল: বন্ধু, পাণ্ডবেরা আমার পিতাকে কূট যুদ্ধে যখন হত্যা করেছিল, তখন যত কষ্ট পেয়েছি, এখন তোমার অবস্থা দেখে তার থেকেও কষ্ট পাচ্ছি। তোমার এই কষ্টের জন্যে যে কোন মূল্য দিতে আমি তৈরী। বন্ধু, তুমি শুধু অনুমতি দাও আমি পিতৃহন্তা পাঞ্চাল এবং পাণ্ডবদের আজই হত্যা করে এই প্রতিহিংসার প্রতিশোধ গ্রহণ করব।

দুর্যোধন খুব কষ্টে টেনে টেনে চোখ খুলল। রক্তবর্ণ দুই আঁখি মেলে ধরল অশ্বত্থামার মুখের উপর। কষ্টের মধ্যে রক্তমাখা বীভৎসমুখে একফালি স্বর্গীয় হাসি, খুশির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। একমুঠি ধুলো নিয়ে আস্তে আস্তে হাতখানা অশ্বত্থামার হাতে রাখল। বলল: দেশের মাটি তোমার হাতে নাও বন্ধু। এ দেশের সম্মান, গৌরব রক্ষার সব দায়িত্বই তোমাকে দিলাম।

দুর্যোধন আর কথা বলতে পারল না। হাতখানা শিথিল হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। রক্তবর্ণ দুটি চোখ নীল আকাশের দিকে মেলে ধরল।

চারদিক থেকে অমাবস্যার ঘন কালো অন্ধকার গড়িয়ে এল দ্রুত। দিনের সমস্ত আলোটুকু শুষে নিয়ে অন্ধকার চাপ চাপ হয়ে পৃথিবীর বুকে থাবা গেড়ে বসল। দেবদারু গাছের মগডালে বসা লাল গলার জঙ্গুলে শকুনটা মহানন্দে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় চিৎকার করে বনের মাংসভুক পশুদের কাছে ভোজের বার্তা পেঁৗছে দিল।

সময়ের গতি তখন দুরন্ত। রাতের অন্ধকারে ওরা তিনজন দেরী না করে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল। ছ'জোড়া ক্ষুরের ঝড় তুলে তিনজনের ঘোড়া পাণ্ডব শিবিরের দিকে ছুটল।

মধ্যরাত।

কুরুবংশের শেষ বংশধর এবং বীর দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদের

ধারে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আর তাকে ঘিরে মাংসভুক পশুর চোখগুলো ক্ষুধায় হিংসায়, লোভে অন্ধকারের মধ্যে জ্বল জ্বল করছে। কিন্তু চারপাশে দাউ দাউ করে অনেকগুলি মশাল জ্বলছিল। আগুনের ভয়ে পশুরা তার ধারের কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিল না। রাগে গজরাচ্ছিল। নিদারুণ আক্রোশে কোন কোন জানোয়ার থাবা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

দূরে, অন্ধকারে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল অনার্যরমণীর সেই কানীন পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। অন্তিম দৃশ্যে মহানায়ক দুর্যোধনের জীবনাবসান দেখতে তিনিও চুপি চুপি উপস্থিত হয়েছেন দ্বৈপায়নে। না এসে তাঁর উপায় ছিল না। আপন অপরাধবোধই তাঁকে টেনে এনেছিল। হয়তো বা ভুল বলা হলো। নির্বিকল্প মহাপুরুষ যে তিনি। তাঁর কোন দুঃখ কিংবা অনুশোচনা থাকতে নেই। তবু দুর্যোধনকে শেষবারের মতো দেখতে এসেছেন। এই দেখার ভেতর তাঁর একটা নৈর্ব্যক্তিক তৃপ্তি ছিল।

এই লোকক্ষয়ী মহাযুদ্ধের বীজ তো সকলের অগোচরে তিনি বপন করেছেন। অম্বিকার গর্ভে তিনি যদি ধৃতরাষ্ট্রকে উৎপাদন না করতেন তাহলে এ যুদ্ধ হতো না। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন একে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কুৎসিত দর্শন তায় আবার নিয়োগ প্রথার নিয়ম মতো সারা অঙ্গে দধি, লবণ, মধু, ঘি জ্যাবজেবে করে মেখে অম্বিকার ঘরে প্রবেশ করল। জানু থেকে জঙ্ঘা পর্যন্ত নিঘৃর্ণ হয়ে অঙ্গ লেহনের আদেশ করলেন অম্বিকাকে। কিন্তু রাজরাণী অম্বিকার সূক্ষ্মরুচি বিসর্জন দিয়ে তাঁর দেহ লেহনে অক্ষমতা প্রকাশ করলো। ভয়ংকর দর্শন ঋষিকে অম্বিকার পছন্দ হলো না। কামার্ত দ্বৈপায়ন তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মিলিত হয়েছিলেন বলেই বুকে তাঁর প্রত্যাখ্যান এবং অপমানের বেদনা নিদারুণ হয়ে বেজেছিল। দ্বৈপায়ন অম্বিকার ঘৃণা প্রত্যাখ্যানের অপরাধকে জীবন ভোর ক্ষমা করতে পারেননি। ক্রোধ অপমানের সব বিষটুকু অম্বিকার প্রপৌত্র দুর্যোধনের উপর উগরে দিয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্যে যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছিলেন* তার শেষ পরিণতি

---

* মৎ-লিখিত 'কুরুক্ষেত্র দ্বৈপায়ন' গ্রন্থটি কৌতূহলী পাঠককে অবশ্যই পড়তে অনুরোধ করব।

এবং সাফল্য দেখতেই দ্বৈপায়নে সশরীরে হাজির হলেন। দুর্যোধনের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু তাঁর জ্বালাধরা অপমানের গায়ে স্বস্তির প্রলেপ মাখিয়ে দিচ্ছিল একটু একটু করে। দুর্যোধনের পতনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমাপ্তি হলো। রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, অপমানের বিষের জ্বালা জুড়োল। প্রতিহিংসার অবসান হলো।

কর্মের গৌরবতৃপ্তি সমাপ্ত করতে দ্বৈপায়ন শেষ দর্শক হয়ে এলেন দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে। মুমূর্ষু দুর্যোধনের মুখের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন শান্ত চোখে। রাত্রির ঘন অন্ধকার গভীর আলিঙ্গনে বেঁধেছে সবাইকে। সব কিছুকে। কেউ আর কিছু দেখছে না, শুনছে না, জানছে না, কারও মুখে প্রশ্ন নেই। কেবল ধারাবাহিক অবলুপ্তি। মৌন গম্ভীর, শান্ত সমাহিত অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গিয়ে দ্বৈপায়ন অনুভব করল, ক্রোধ, বিদ্বেষ, লোভ-প্রতিহিংসা, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া, জন্ম-মৃত্যুর অমীমাংসিত রহস্যের শেষ হয় না কোনকালে। শেষ হলে বোধহয় পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন বন্ধ হয়ে, গতি থেমে যেত। এ হলো বিশ্ববিবর্তনের নিয়ম। এই নিয়ে পৃথিবীর পরিক্রমণ। পদে পদে মানুষের স্খলন যেমন অনিবার্য, তেমনি তার ভুলেরও শেষ নেই। এই সব আছে বলেই তো পৃথিবীর আবর্তন বন্ধ হয়ে যায়নি। মাটি ও চাকার নিরন্তর সংঘাতে যেমন রথ গতিশীল হয় তেমনি জীবন রথের চাকায় গতির জোয়ার আনতেই যেন ক্ষমার মধ্যে প্রতিহিংসা, প্রেমের মধ্যে ঘৃণা, ত্যাগের মধ্যে লোভ, ধর্মের নামে অধর্ম, মৈত্রীর নামে বৈরীতা, বন্ধুত্বের নামে বিশ্বাসঘাতকতা—ঘটনা-দুর্ঘটনার উত্তাপ তরঙ্গে বিধ্বস্ত হতে হতে এগিয়ে চলেছে অনিবার্য পরিণতির দিকে। একে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না তার কারণও ঐ বিশ্ববিবর্তন। তার অনিবার্য বেগের দিকে আমরা সকলেই কেবল আকর্ষিত হচ্ছি। আমাদের সাধ্য নেই তা থেকে মুক্ত থাকা। আমরা মহাকালের রথচক্র মাত্র। আমরা কিছুই করি না মহাকাল আমাদের দিয়ে সব করে নেয়। ঋষি হলেও আমার সাধ্য ছিল না তার আকর্ষণ থেকে সরে থাকার। আমিও সময়-স্রোতে ভেসে আসা একটি খড়কুটো মাত্র।

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের বুক থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শ্বাসের

সঙ্গে অনেক উদ্বেগ, ভয়-ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা সব বেরিয়ে গেল। সাফল্যের আনন্দে টৈ টম্বুর হয়ে গেল তাঁর বুকের ভেতরটা। নিজেকে বড় সার্থক লাগল। বিস্ফারিত চোখে দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর ঠোঁট দুটো কয়েকবার মৃদু কাঁপল। একটু হাসলেনও। তৃপ্তির হাসি। সাফল্যের হাসি।

তবু মানুষের মন তো। মন থাকলেই তার আনন্দের সঙ্গে বিষাদ দুঃখ যন্ত্রণাও থাকে। সেই কষ্টে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। অপরাধ সচেতন মনটি বিড় বিড় করে বলল ঃ দুর্যোধন, অনন্তধামের যাত্রী তুমি। তোমার মৃত্যুই তোমাকে মহিমান্বিত করবে। বৎস যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু বাহুবলে জেতা যায় না, কূটবুদ্ধিও দরকার হয়। বাহুবলের সঙ্গে কূটযুদ্ধের সমন্বয়ে যে যত দক্ষ জয় ততই তার সুনিশ্চিত হয়। নিয়ম নীতি মেনে যুদ্ধ করে কি লাভ হলো তোমার? আগামী প্রজন্ম তোমার ব্যর্থতা পরাজয় থেকে শিক্ষা নেবে। তুমি চিরস্মরণীয় হবে। তোমার মৃত্যুটা কেউ ভুলবে না কোনদিন।

অশেষ ক্ষমা মাখানো সেই কথাগুলোর সৌরভে বাতাস সুবাসিত হলো। দুর্যোধন সম্পর্কে এরকম একটা অদ্ভুত ভাবান্তরে দ্বৈপায়ন নিজেও কম অবাক হননি। তাঁর মাথা ও বুক জুড়ে কত রকমের কত জিজ্ঞাসার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল।

সহসা অশ্বখুরের শব্দে দ্বৈপায়ন চমকে উঠলেন। কারণ জীবনের কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর একা-একাই দিতে হয় নিজেকে। সেই কঠিন পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্যে হতচকিত হয়ে গেলেন। অশ্বখুরের শব্দে সেই আচ্ছন্নতার ভাবটা কেটে গেল। কেউ দেখে ফেলার আগেই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন চুপি চুপি অন্ধকারে প্রস্থান করল।

নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে অশ্বখুরের দ্রুত পদশব্দ দ্বৈপায়নময় ছড়িয়ে পড়ল হাহাকারের মতন।

অবলুপ্তপ্রায় চেতনা থেকে দুর্যোধন সহসা জেগে উঠল। খুব কষ্ট করে চোখ মেলল। নিভন্ত মশালের নিস্প্রভ আলোয় ভালো

করে কিছু দেখতে পেল না। মরণের ঘুমে জড়িয়ে আসছে দু'চোখ। কষ্টে মুখ থেকে অস্পষ্ট গোঙানির ক্ষীণ শব্দ থেমে থেমে বের হচ্ছিল।

পাঁচটি ছিন্নমুণ্ড হাতে করে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা দুর্যোধনের সামনে এসে দাঁড়াল।

মশালের আলো পড়েছে তাদের গায়ে মুখে। মশালের শিখায় লাল হয়ে গেছে বনভূমির নিরন্ধ্র অন্ধকার আর তাদের সর্বশরীর।

দুর্যোধনের আধবোজা ঘুম ঘুম চোখে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। অধরে এক ফালি হাসি ফুটল। মুখের ভাবও বদলে গেল। মনে হলো, দারুণ প্রাপ্তির সুখে, আনন্দে এবং চরিতার্থতায় তার ভেতরটা ভরন্ত কলসের মতো ভরে যেতে লাগল। সেই মুগ্ধতা তার নীরব অভিব্যক্তিতে লেগে রইল।

দারুণ উল্লাসে আর উত্তেজনায় অশ্বত্থামার গলার স্বর কাঁপছিল। বলল: বন্ধু আমরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করে ফেলেছি। পাঞ্চালের রাজপুত্রদের আর পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্রের ছিন্নমুণ্ড দিয়ে তোমাকে শেষ বিদায় জানাচ্ছি। পিতৃ-শত্রু পাঞ্চাল রাজবংশকে নির্বংশ করেছি। পাণ্ডবদের একজন বংশধরও আর জীবিত নেই। কেবল তোমার চিরশত্রু পঞ্চপাণ্ডব এখনও জীবিত। পাণ্ডব শিবিরে তারা কেউ ছিল না। তাদের কপটতার কাছে এবারও হেরে গেলাম। আমাদের জয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। যুদ্ধের শেষ সেনাপতি শেষ যুদ্ধের সাফল্যের সর্বশেষ সংবাদটি তোমাকে দিতে পারল না। এই অনুশোচনা কাঁটার মতো বিঁধছে আমাকে।

দুর্যোধন ঘুম ঘুম চোখে অশ্বত্থামার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। অসহায়ভাবে কাতরাতে কাতরাতে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে থেমে থেমে বলল: এটাই বা কম কি। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, বন্ধু কর্ণ সারা যুদ্ধে যা পারল না তোমরা তো সেই অসাধ্য সাধন করলে এক রাতে। তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। মৃত্যুর আগে তো শুনে গেলাম, চিরশত্রু পাণ্ডবদের জয়ের ঘরে প্রতিহিংসার আগুন লেগেছে। অধর্ম করার শাস্তি পেয়েছে। বন্ধুত্বের এতবড় প্রতিদান আমার মৃত্যুকালীন পাথেয়।

দুর্যোধন হাঁফাচ্ছিল। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। দম নিতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। গলা দিয়ে একটা ঘর্ঘর শব্দ বার হচ্ছিল। নাভির কাছ থেকে একটা কাঁপুনি উঠে এল। আস্তে আস্তে দেহটা নিস্তেজ হয়ে গেল। একটা লম্বা শ্বাস পড়ার পরে দেহ স্থির হয়ে গেল। জীবনের সব প্রাপ্তিকে অপ্রাপ্তির অতল গর্ভে নিক্ষেপ করে একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে যাওয়ার শব্দই যেন শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল। মনে হলো, প্রাণ পাখিটা ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে বন জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে নির্জন নীল আকাশের বুকে মিলিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে কোথায় যেন ভোর হলো। বনমোরগ তারস্বরে ডাকল। ফিকে অন্ধকার যেন হেমন্তের শিশির মাখানো ভোর সকালের নীল আকাশের গায় কাঁচ রোদের আলোর ছটার সঙ্গে গলাগলি করে স্থির হয়ে আছে। রঙ মশালের আলোয় গোটা আকাশটাই রাঙা হয়ে আছে। গাছের শাখায় শাখায় পাখিরা মুক্তির গান গেয়ে উঠল। প্রজাপতির দল রঙিন পাখা মেলে উড়ে গেল ফুলের বনে। ঝিরে ঝিরে বাতাস বুনো ফুলের গন্ধে ভরে রইল।

মিষ্টি আলোর স্পর্শে অশ্বত্থামার ভেতরটা চমকাল। বেশ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। গতরাতের বিভীষিকা তার ভয়চকিত চোখের চাহনিতে তখনও থম থম করছিল। তার দৃষ্টি ভোরের আলো আঁধারের জটিল রহস্যের মধ্যে ডুবে রইল।

দুর্যোধনের নিষ্প্রাণ দেহের দিকে চেয়ে অশ্বত্থামার মনে হলো দুর্যোধনের অস্তিত্বটা পৃথিবী জুড়ে ভীষণভাবে আছে—বাতাসের মতো, আকাশের মতো। পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নেবার সময় সেই কথাটাই প্রকৃতি নিরুচ্চারে জানিয়ে দিল; দুর্যোধন ছিল এবং থাকবে। প্রকৃতি নিজের হাতে তার শেষযাত্রার মুহূর্তটিকে চতুর্দিক থেকে অপরূপ করে সাজিয়ে দিল। স্বর্গের পুষ্পবৃষ্টি চোখে দেখা যায় না, কবির কল্পনা। কিন্তু মর্তের মান্দার মঞ্জরী থেকে অজস্র শুভ্র ফুল স্বর্গের আশীর্বাদের মতো সারা রাত ধরে দুর্যোধনের উপর একটি একটি করে ঝরে পড়ে তাকে ঢেকে দিয়েছিল। প্রজাপতিরা স্বর্গের দ্বারীর মতো আগে আগে তাকে পথ দেখিয়ে

চলল। মৌমাছি আর ভ্রমর গুণ গুণ করে স্বর্গের অপ্সরার মতো যশোগান করতে লাগল তার। বনমোরগ আর পাখিরা চিৎকার করে ভাটদের মতো দুর্যোধনের প্রশস্তি করে বলল ঃ সাধু, সাধু।

অনুভূতিটা হঠাৎ-ই অশ্বত্থামার বুকের গভীরে কি সব গলিয়ে দিয়ে গেল যেন। কতরকমের যে বিস্ফোরণ ঘটে গেল অন্তরাজ্যে তা নিজেই জানে না। একটা গভীর কান্না পাক দিয়ে দিয়ে চোখের কোণে জমা হলো গড়িয়ে পড়ার জন্যে। বুকটা হাহাকার করে উঠল। বড় একা হয়ে গেল যেন। চোখে কোন দৃষ্টি নেই। মণি স্মৃতি ভারাক্রান্ত।

মানুষ হঠাৎ অবলম্বনহীন হলে যেমন অসহায়ভাবে আর্তনাদ করে উঠে তেমনি একটা প্রগাঢ় শূন্যতাবোধ থেকে অশ্বত্থামার অন্তঃকরণের গভীরে প্রশ্নটা নিরুচ্চারে উৎসারিত হলো। বলল ঃ আমার জীবনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করলে কেন তুমি? বুকে এ কিসের আগুন জ্বালিয়ে রাখলে? তোমাকে সুখী করতে গিয়ে যে, আমি নিজেই ফতুর হয়ে গেলাম। এখন আমি কী করব?*